বিজ্ঞান অন্বেষক

ISSN 2582-5674
RNI : WBBEN/2003/11192
বর্ষ -২০ সংখ্যা-২
মার্চ-এপ্রিল ২০২৩
মূল্য : ২০ টাকা

ক্যানসার সংকটে বর্তমান বিশ্ব

প্রচ্ছদ কথা

- ক্যানসার রোগের সংকটে আধুনিক বিশ্ব
- ক্যানসার থেকে বাঁচতে কি খাব, কি খাব না?
- ক্যানসার সারাতে সিউডোমোনাস ব্যাকটিরিয়া
- টি সেলের রিসেপ্টর সব ক্যানসার সারাবে।

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

গাছটা কেটে ফেলেছিল, সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল বাংলার অতি বিপন্ন একটা গাছের নতুন করে অঙ্কুরোদ্গমের অনেকগুলো নিশ্চিত সম্ভাবনা। তালিয়েব গাছটা কেটে ফেলেছিল, সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল বাংলার অতি বিপন্ন একটা গাছের নতুন করে অঙ্কুরোদ্গমের অনেকগুলো নিশ্চিত সম্ভাবনা। তালিয়েবগাছের বীজ যেখানে পড়ে সেখানেই গাছটাকে বড় হতে দিতে হয়, কারণ প্রথম পাতা বের হওয়ার আগেই গাছের শিকড় অনেক লম্বা হয়ে যায়, তাই এক জায়গা থেকে চারা তুলে অন্য জায়গায় পুঁতলে, শিকড়ের ক্ষতি হওয়ার জন্য গাছ বাঁচানো যায় না। গাছটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার এটাও একটা কারণ। এ.পি. বেনথাল তাঁর 'ট্রিজ অফ ক্যালকাটা অ্যাণ্ড ইটস নেবারহুড' বইটাতে লিখেছিলেন ১৯৪৩-তে তিনি হাওড়ার উদ্ভিদ উদ্যানের বাইরে তালিয়ের গাছ দেখেননি। ১৯৯৮ সালের কথা। একদিন সকালে ড শ্যামল বসুর ফোনাঘাত। একবার সময় করে চলে এসো হাওড়ার বোটানিক গার্ডেনে, ওখানে তালিয়ের গাছে ফুল ফুটছে। এবার না দেখলে জীবনে আর দেখতে পাবে না, মেয়েকেও নিয়ে যেও, ও আর দেখতে পাবে কিনা জানি না। ড বসুর কথা মত নানারকম ক্যামেরা, লেন্স, ক্যামেরা বসানোর তেপায়া (Tripod) নিয়ে সৌমেন আমি তিন্নি হাজির হলাম পরের রোববার, শতাব্দীতে একবার ফোটা ফুল দেখার জন্যে।

ফুল পরিণত হওয়ার সময় গাছের পাতা ক্রমশ শুকিয়ে ঝরে যেতে থাকে। ফল ধরার সময় গাছে আর পাতা থাকে না তখন ১০ মিটার লম্বা কাণ্ডের ওপর ৬ মিটারের প্রধান পুষ্পমঞ্জরীদণ্ডটাকে নিচ থেকে কাণ্ডের অংশ মনে হয়, আর শাখাপুষ্পমঞ্জরীদণ্ডগুলোকে শাখা-প্রশাখা মনে হয়। ১৯৯৯ সালে এই গাছটা ফুল, ফল দেওয়া সম্পূর্ণ করে। ওটা মরে যাওয়ার পর এখন আর দেখে চিনতে পারার মতো বড় গাছ ওখানে নেই।

ড শ্যামল বসুর (পাম বিশেষজ্ঞ) কাছে জানা যায় ২০০১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় তিনি ও বিজ্ঞানী সালার খান একটি তালিয়ের চিহ্নিত করেন। ২০০৮ সালে ফুল, ফল দেবার পর গাছটি মারা যায়। বর্তমানে পৃথিবীর বন্য পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত তালিয়ের। বিজ্ঞানী শ্যামল বসুর মতে হাওড়ার উদ্ভিদ উদ্যানের বাইরে ঐটি ছিল একমাত্র তালিয়ের। ২০০৮ সালে ওটা ফুল দেওয়া শুরু করে ফল, ফুল দেওয়ার শেষে ২০১২ সালে ওটা মারা যায়।

১০ জুলাই ২০১৬ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুসারে ('গৌতমের হাত ধরে ফিরল বিরল তালিপাম') রামপুরহাট ছাতরা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌতম রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঁচটি চারা এনে বিশ্বভারতীতে লাগান।

২০১৫ সালের ৫ অক্টোবর প্রকাশিত বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকা 'প্রথম আলো'র খবর অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগানের মালী জাহাঙ্গীর আলম ঐ ২০০৪ সালে ফুল দেওয়া গাছের বীজ থেকে চারা তৈরি করতে সক্ষম হন। সেসব চারার কয়েকটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রাজশাহী ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ওখানকার বনবিভাগে দেওয়া হয়। প্রথম আলোর খবর অনুসারে সে সময় মোট ৩০০টি চারা তৈরি করা হয়েছিল।

হিসেব মতো সেসব গাছের ফুল আমরা দেখে যেতে পারব না। বাংলার অতি বিপন্ন এই গাছটা সম্পর্কে যদি সাধারণ মানুষ সচেতন হয় তবে কোথাও যদি গাছটা থেকে থাকে তবে তার খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। আবার বহুদিন কেটে গেলেও বিশেষ কোন তালগাছে ফুল ধরছে না বলে গাছটা কাটার আগে খোঁজ নিয়ে জানা যেতে পারে গাছটা তালিয়েরা নয়তো...।

IUCN-এর Red list অনুসারে এই গাছটা বন্য স্বাভাবিক অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত লেখা হয়েছে।

লেখক বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক ● email : jayshree.datta@yahoo.co.in ● M. 9831060548

বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

প্রবীর বসু

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সরদার, চন্দন সুরভী দাস, দীপাঞ্জন দে, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, তুষার কান্তি নাথ, শতাব্দী দাশ, সোমা বসু, অর্চন সমাজদার, উজ্জ্বল কান্তি রায়

উপদেষ্টামণ্ডলী

সমর বাগচী, শঙ্কর কুমার নাথ, দীপক কুমার দাঁ, সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, প্রকাশ দাস বিশ্বাস, রাজা রাউত, তপন দাস, মানসপ্রতীম দাস, সুমিত্রা চৌধুরী, জয়শ্রী দত্ত, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, তপন সাহা

: website :

www.ssu2011.com/bigyan-anneswak

: e-mail :

bigyanannesak1993@gmail.com.

: Whatsapp No. :

9830676330 / 9143264159/7980121478

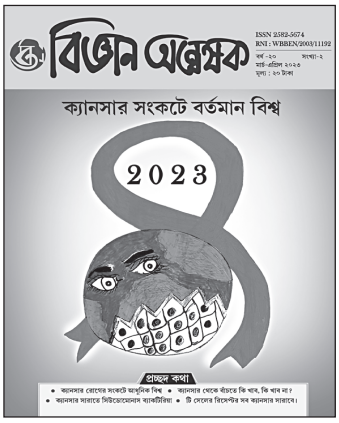

প্রচ্ছদ

কমলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষিতম্

প্রকৃতি মানুষের প্রয়োজন মেটানোর মত সবকিছুই যথেষ্ট পরিমাণে দিয়েছে, কিন্তু মানুষের লোভ মেটানোর জন্য নয়। —গান্ধি

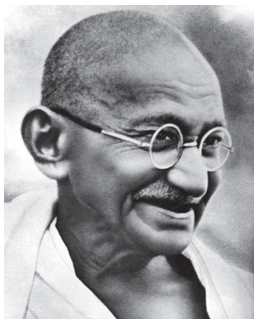

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সম্প্রতি হিমালয় পাহাড়ে ধ্বসের কারণ খুঁজতে গেলে এর জন্ম ইতিহাসের দিকে একটু নজর দিতে হবে। হিমালয় হল পৃথিবীর নবীনতম পর্বত। প্লেট হেক্টনিক্স তত্ত্ব অনুযায়ী মহাদেশ ও মহাসাগর সমেত গোটা পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ কয়েকটি প্লেটের সমন্বয়ে তৈরি। এরা প্রায় ৬৫ কিমির মতো পুরু। পৃথিবীর একেবারে উপরের স্তর হল তার ত্বক। এর নিচে যে শিলাস্তর রয়েছে তার উপরে এই প্লেটগুলি নড়েচড়ে বেড়ায়। এদের গতির পরিমাণ খুবই মন্থর। বছরে হয়তো দুই থেকে দশ সেন্টিমিটারের মতো। এই প্লেটগুলির সংঘাতে সৃষ্টি হয়েছে হিমালয়। হিমালয়ও ছিল একদিন সাগরের রাজত্ব। সেই সাগর থেকে মাত্র দু কোটি বছর আগে হিমালয়ের মাথা তুলে দাঁড়ানোর ঘটনা ভূতাত্ত্বিক বিচারে প্রায় সেদিনের ঘটনা।

হিমালয়ের মতো যে পর্বতে স্থিতিশীলতার অভাব, বিশেষজ্ঞরা সেখানে কোনো বড় মাপের নগরায়ণ, জলাধার, রাস্তাঘাট নির্মাণ বা যে কোনও বড় মাপের গঠনমূলক কাজের বিরোধী। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে সব নিষেধাজ্ঞাই লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে সুদীর্ঘকাল ধরে। চলছে অরণ্যনিধন যা সম্পূর্ণভাবেই বেআইনি। তাছাড়া জল কখনও কখনও পর্বতের শিলাস্তরে ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করে তার গঠন সংস্থান দুর্বল করে তুলছে। এগুলিই মূলত পাহাড়ের ধ্বসের কারণ।

সম্প্রতি বদ্রীনাথের পথে যোশীমঠে সর্বত্র ফাটল ধরছে। পরিবেশবিদ ও যোশীমঠের বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর চারধাম প্রকল্পের জন্য রাস্তা চওড়া করতে গিয়ে পাহাড়ের ঢাল কেটে খাড়াই করে ফেলা হয়েছে। এছাড়াও এনটিপিসির বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য সুড়ঙ্গ খোঁড়ার যন্ত্র আটকে যাওয়াতে যথেচ্ছ বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। তারপর থেকেই নতুন করে ফাটল তৈরি হয়েছে। মনে করা হচ্ছে ওই যন্ত্র ভূগর্ভস্থ জল ধরে রাখার পাথরে ধাক্কা মেরেছে। তারপরেই মাটি ফেটে জল বের হতে শুরু করেছে। পরিবেশবিদদের আপত্তিতেই ২০১০ সালে উত্তরাখণ্ডের তিনটি বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজও সেই প্রকল্পের সুড়ঙ্গ বোজানোর কাজ হয়নি। যোশীমঠ সম্পর্কে ১৯৭৬ সালে গাড়োয়ালের মহেশচন্দ্র মিত্র কমিটির রিপোর্টেই বলা হয়েছিল যোশীমঠের ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ এমনই যে অত্যধিক চাপ পড়লে যোশীমঠ তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। যোশীমঠ ইতিমধ্যেই ৫-৭ সেমি বসে গিয়েছে।

শুধুমাত্র যোশীমঠই নয়। কর্ণপ্রয়াগেও বিপদ ঘন্টা বাজতে শুরু করেছে। যোশীমঠ আউলি রোপওয়ে ইতিমধ্যে বন্ধ রাখা হয়েছে। যোশীমঠের অধিকাংশ অঞ্চলে ধ্বংসের প্রভাবে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। যোশীমঠ-বদ্রীনাথের পথে ফাটল দেখা দিয়েছে। উত্তরাখণ্ডে টেহরি গাড়োয়াল অঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতেই যোশীমঠের মতো ফাটল দেখা দিচ্ছে। চাম্বাতে ৪০০ মিটার লম্বা সুড়ঙ্গ প্রকল্পকে এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে থেকেই চাম্বা নদীর ভূপ্রাকৃতিক পরিস্থিতির বদল ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় ফাটল দেখা দিচ্ছে। আসলে সমগ্র গাড়োয়াল অঞ্চলই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

দেখা যাচ্ছে মানুষের সর্বগ্রাসী ক্ষুধাই মানুষকে ক্রমশ হিমালয় বাসের অযোগ্য করে তুলেছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই শিল্পায়ন ও বিজ্ঞান যেভাবে প্রকৃতিকে জয় করেছে তেমনি নানা বিপত্তিকেও ডেকে এনেছে। মানুষ ভেবেছে যেহেতু পৃথিবী তার ভোগসামগ্রী, অতএব তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যেতেই পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, জীব প্রকৃতিরই সৃষ্টি এবং অংশ। জীবের মঙ্গলের জন্যই প্রকৃতিকে উপযুক্তভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। একাজে গাফিলতি হলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেবেই।

ISSN 2582-5674

9 772582 567004

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যোগাযোগ : ৭৯৮০১২১৪৭৮/৯২৩১৫৪৫১৯১/৯৪৩২৩৩৫৮৮২/৮৯৪৪৯৯৬৭৫৫/৭০০১৩৩৭৭১৪

সূচি

৩ ক্যানসার রোগের সংকটে আধুনিক বিশ্ব
কমলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

৭ ক্যানসার থেকে বাঁচতে কি খাব, কি খাব না?
ডা. শঙ্কর কুমার নাথ

১০ ক্যানসার সারাবে সিউডোমোনাস ব্যাকটিরিয়া
অজয় মজুমদার

১২ প্রচ্ছদকথা ৪
টি-সেল
অজয় মজুমদার

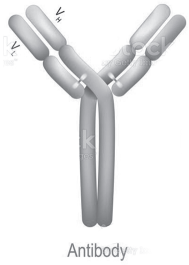

১৩ সুরধনী নদী, জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

১৪ কত জনপদ হারিয়ে গেলে, মানবে তুমি শেষে
বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

১৬ পাখি চিনতে ছ'বছর
সৌম্যকান্তি জানা

১৮ বন্ধু সরীসৃপ ড. শুভাশিস পাল

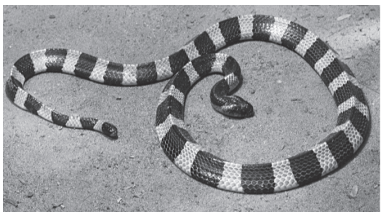

১৯ আলোচনায় খুঁজেছি এগোনোর পথ
সায়ন্তন যশ

২০ ইনফ্রারেড থার্মোমিটার
অনিন্দ্য দে

২২ রাশির মজা
ড. গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী

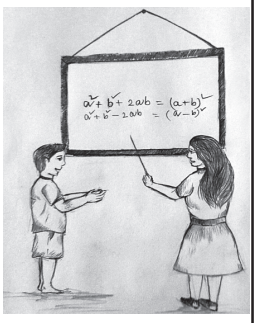

২৩ স্পেস-টাইম কন্টিনিউয়াম
দিগন্ত পাল

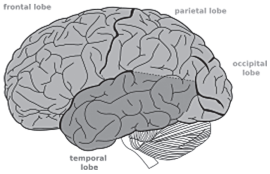

২৬ অ্যাডিনোভাইরাস
ড. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

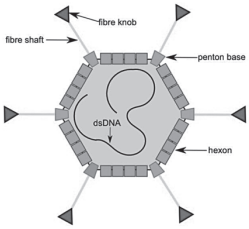

২৭ টমাস আলভা এডিসন
অসিত ঘোষ

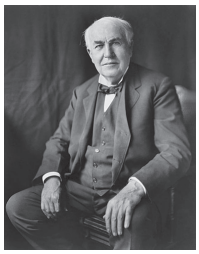

২৯ চিঠিপত্র : আলোচনা
ড. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

৩০ নীলকুরিঞ্জির নীলিমায়
ড. তুষার কান্তি নাথ

৩২ অঙ্গারক যোগ
ডা. ভবানীপ্রসাদ সাহু

২য় প্রচ্ছদ
নতুন গ্যালাক্সি সন্ধানে
কৌশিক রায়

৩য় প্রচ্ছদ ও ৪র্থ প্রচ্ছদ
যারা হারিয়ে যাচ্ছে তালিয়ের জয়শ্রী দত্ত

প্রচ্ছদ কথা ১

ক ম লি নী ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

ক্যানসার রোগের সংকটে আধুনিক বিশ্ব

বর্তমান যুগে বিশ্বজুড়ে প্রতীয়মান ভয়ঙ্কর একটি রোগ, যা সম্ভাবনাময় প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে, তার নাম 'ক্যানসার' বা ভালো বাংলায় 'কর্কট রোগ'। বুৎপত্তিগত দিক দিয়ে 'Cancer' শব্দটির জন্ম গ্রীক শব্দ 'Karinos' থেকে। যার অর্থ crab বা কাঁকড়া (কর্কট)।

সারা পৃথিবীতে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, গবেষক বা চিকিৎসকের কাজ কিছুটা ফলপ্রসূ হলেও অদ্ভুত ভাবে আজও ক্যানসারের স্থায়ী ভ্যাকসিন এবং সঠিক বা নির্দিষ্ট কারণ আবিষ্কৃত হয়নি। ক্যানসারকে তাই এখন 'group of disease' তথা অনেক রোগের সমাহার আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তবে এই রোগটি যে একদম আধুনিক নব্যযুগীয় রোগ, তা কিন্তু নয়। ঐতিহাসিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, প্রাচীন যুগে মিশরের 'ফ্যারাও'-এর মমিতে এই রোগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। অর্থাৎ কয়েক হাজার বছর আগে যখন ফ্যারাওরা জীবিত ছিলেন তখনও তাদের দেহে এই কর্কট রোগ বাসা বেঁধেছিল।

সেই রেনেসাঁর সময় থেকেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের স্বর্ণযুগ শুরু হয়েছে। তাই অনেক বৈজ্ঞানিকের মধ্যে জন হান্টারও স্বমহিমায় তাঁর আপন স্থান অধিকার করে নিয়েছেন এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। তিনি বলেন, ক্যানসার কোশ যদি চলমান না হয়, তবে তা সার্জারির মাধ্যমে উপশম হতে পারে।

এবার চলে আসি, আজকের অত্যাধুনিক যুগের WHO তথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কথায়, যারা বলছে, ২০২০-র মধ্যে এই পৃথিবী প্রায় এককোটি মানুষকে হারিয়েছে এই কর্কট রোগের কারণে। তারা আরও বলেছে যে, বিশ্বে প্রতি ছয়টি মৃত্যুর মধ্যে একটি মৃত্যুর কারণ হল এই কর্কট রোগ! তবে ভয়ে ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ ক্যানসার অনেক মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে পারেনি। নিজ গুণে অনেক প্রতিকূলতা জয় করে সর্বোপরি মৃত্যুকে জয় করে তাঁরা ফিরে এসেছে বীর-বিক্রমে। অনেক জনপ্রিয় খেলোয়াড়, অভিনেতা তাঁদের মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসার কাহিনিও আমাদের বলেছেন কিংবা আত্মবিবরণীতে প্রকাশ করেছেন। এবার আমরা লেখার মূল পটভূমিকায় যাব, যেখানে দেখব যে, ছয় থেকে নয় লক্ষ কোটি কোশের মধ্যে টিউমারের উদয় কিভাবে ক্যানসারের সূচনা করে।

ভাবতে অবাক লাগে, একটি মাত্র কোশ থেকে উৎপন্ন হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে কত বড় বড় জন্তু, জানোয়ার, উদ্ভিদ, মানুষ কি সাংঘাতিক দুর্নিবার গতিতে রাজত্ব করে চলেছে। তবে এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এখনো পর্যন্ত মানুষই আছে! এবার এই একটি কোশ থেকে পূর্ণাঙ্গ জীব কীরূপে সৃষ্টি হয়, তার গল্প জেনে নেওয়া যাক।

অর্ধেক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট, একটি পুংজনন কোশ ও একটি স্ত্রী জননকোষ নিষেক প্রক্রিয়ায় একত্রে মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ ক্রোমোজোম বিশিষ্ট একটি জাইগোট তৈরি করে।

একটি কোশ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে বহুকোশীতে পরিণত হয়। বহুকোশী প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই জাইগোট যখন বিভাজিত হয়, তখন সে টোটিপোটেন্সি ধর্ম দেখায় যা প্রকৃত স্টেমসেল নয়। এই টোটিপোটেন্সির অর্থ হল একটি কোশ পূর্ণাঙ্গ প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার ক্ষমতা রাখে।

এখন এই এককোশী জাইগোট প্রথমে মরুলা, ব্লাস্টুলা তারপর গ্যাস্ট্রুলা দশার মধ্যে দিয়ে বিভাজিত হতে থাকে। Identical twin তথা সমজাইগোটীয় যমজের ক্ষেত্রে দেখা যায়। তাদের ক্ষেত্রে একটি জাইগোট থেকে একই রকমের দেখতে দুটি সন্তান জন্ম হয়েছে। এর অর্থ হল ব্লাস্টোমিয়ার আলাদা হয়ে গিয়ে টোটিপোটেন্সির মাধ্যমে সমদর্শী দুটি যমজ তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে, ক্রমাগত বিভাজনে কোশের সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে, ততই কোশের এই ক্ষমতা লুপ্ত হতে থাকে। যেই কারণে পরিণত মানুষের রক্তের কোশ কখনোই একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরি করবে না, কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একটি পাতা থেকে প্ল্যান্টলেট গঠন করে অনুবিস্তারণ পদ্ধতিতে একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ গঠন করা সম্ভব, কারণ পরিণত উদ্ভিদে এই টোটিপোটেন্সি ধর্ম থেকে যায়। অর্থাৎ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই ধর্ম খুবই সাধারণ ব্যাপার।

এখন, কোশ বিশেষ করে প্রাণীকোষ টোটিপোটেন্সি ধর্ম হারালেও বিভিন্ন রকম দেহকোশে বিভেদিত হওয়ার ক্ষমতা দেখায় যাকে প্লুরিপোটেন্সি ধর্ম বলে। ভ্রূণের মধ্যে থাকা স্টেমকোশ বা Stem cell এই প্লুরিপোটেন্সি ধর্ম দেখায়। ব্লাস্টুলা তৈরির প্রথম দিকে এই ধর্ম দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে যখন কোশের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যায়। সেই সময় কোশগুলিকে বলা হয় determined. ঠিক যেমন আমরা কোনো কাজ যখন ঠিক করবই সিদ্ধান্ত নেই বা determined হয়ে যাই।

এই সময় বিভাজনরত কোশগুলি পূর্ণাঙ্গ প্রাণী সৃষ্টি করার ক্ষমতা না দেখালেও একাধিক রকম দেহকোশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। যেই ধর্মকে বলা হয় Differentiation. অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে determined কোশগুলি কিছু নির্দিষ্ট কোশসমষ্টি বা কোশে পরিণত হয়। যেমন— স্নায়ু কোশ, যকৃৎ কোশ, বৃক্কের কোশ ইত্যাদি।

এরপর ক্রমান্বয়ে মাইটোসিস কোশ বিভাজনের ফলে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সৃষ্টি হয়। তখন ওই প্রাণীকোশের নির্দিষ্ট ভাগ্য ও কর্মও স্থির হয়ে যায়। যেমন— বৃক্ক কোশ মূত্র তৈরিতেই সাহায্য করবে, স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনে সাহায্য করবে না। এইভাবে যথাক্রমে টোটিপোটেন্সি ও প্লুরিপোটেন্সি ধর্মের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী তৈরির প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হয়।

এবার আসা যাক, ক্যানসার কি তার প্রসঙ্গে। ক্যানসার হল এক ধরনের রোগ, যেখানে অনিয়ন্ত্রিত ও অস্বাভাবিকভাবে কোশ বিভাজন, টিউমার বা নিওপ্লাজমের সৃষ্টি করে। এই টিউমার হল কতকগুলি কোশপুঞ্জও, যেটি দুই রকমের হতে পারে। যথা— বিনাইন ও ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। বিনাইন টিউমারটি নিরীহ প্রকৃতির। এটি তার নিজস্ব অবস্থানে অনড় থাকে। কিন্তু নিরীহ টিউমারটিই সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে এবং একস্থানে স্থির না থেকে এক অঙ্গ থেকে আর এক অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। এই ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হল কতগুলি ক্যানসার কোশের সমষ্টি। এই ম্যালিগন্যান্ট কোশগুলি কিছু নির্দিষ্ট ধর্ম দেখায় যা সাধারণ কোশগুলি দেখায় না। যেমন— অনিয়ন্ত্রিত ভাবে কোশ বিভাজন, ইনভেশন ধর্ম, অ্যানজিওজেনেসিস ইত্যাদি যেগুলি ক্যানসার কোশের অন্যতম হলমার্ক হিসাবে কাজ করে।

অনিয়ন্ত্রিত কোশ বিভাজনের ক্ষেত্রে অনেকগুলি কোশ পুঞ্জিভূত হয়ে একটি lump বা দলা তৈরি করে যেখানে কোশগুলি অবিন্যস্তভাবে সজ্জিত থাকে।

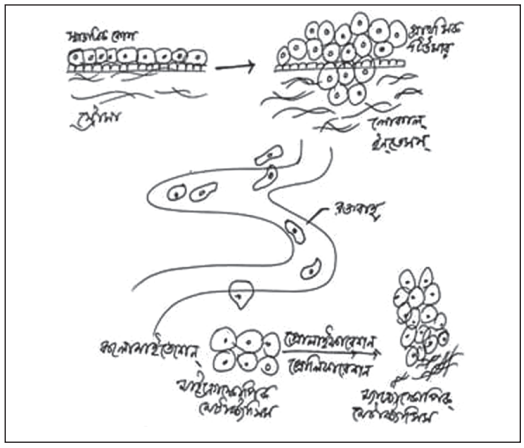

আর ইনভেশন-এর ক্ষেত্রে, ক্যানসার কোশগুলি সরাসরি প্রতিবেশী কোশে দখলদারি করে। এছাড়া রয়েছে মেটাস্ট্যাসিস ধর্ম, যার মাধ্যমে রূপান্তরিত কোশগুলি এক অঙ্গ থেকে অপর অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। কোনো সংবহন তন্ত্র বানিয়ে নিয়ে এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে ক্যানসার কোশের সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু হয়। এই নিজের মতো সংবহনতন্ত্র তথা রক্তবাহ বানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে বলে অ্যানজিওজেনেসিস!

এছাড়াও এদের কোশগুলি contact inhibition নিয়মনীতিকে কোনো পরোয়া করে না। সাধারণত কোনো কোশ তার পার্শ্ববর্তী কোশের উপর উঠে যায় না। Stop signal-এর মাধ্যমে তারা তাদের নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কোশ বিভাজন সম্পন্ন করে। কিন্তু ক্যানসার কোশগুলি stop signal-কে অগ্রাহ্য করেই একে অন্যের ঘাড়ে উঠে পড়ে। তাছাড়া এদের পুষ্টিরও কোনো অভাব হয় না যেহেতু অ্যানজিওজেনেসিস-এর মাধ্যমে এরা রক্তবাহ তৈরি করে নেয়।

আবার এই ক্যানসার কোশ খারাপ কোশগুলিকে নিয়ন্ত্রিতভাবে মরে যেতে দেয় না। অর্থাৎ কোশের অ্যাপোপট্‌সিস হতে দেয় না। যার কারণে মৃত্যু-আবশ্যিক কোশগুলিও আর ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে না। ক্রমশ কোশের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

উপসর্গ

অন্যান্য অনেক রোগের মতোই ক্যানসার রোগেরও কিন্তু উপসর্গ রয়েছে, যা অনেকেরই অজানা। সেই কারণে ওই নির্দিষ্ট উপসর্গগুলি দিনের পর দিন এড়িয়ে যাওয়ার ফলেই একসময় এই ছোট টিউমারটি ভয়াবহ রূপের আকার ধারণ করে।

মোটামুটি প্রায় শতাধিক রকমের ক্যানসার হতে পারে। এই প্রতিটি ক্যানসারের প্রকৃতি ব্যক্তিবিশেষেও আলাদা হয় ও প্রতিটি ক্যানসার আলাদা রকমের হয়। ক্যানসারের উপসর্গ কিরকম হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে ক্যানসারের অবস্থানের উপর এবং মেটাস্ট্যাসিসের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর।

তবে কিছু সাধারণ উপসর্গের কথা জানা গেছে, যেমন— জ্বর আসা, ব্যথা, ক্লান্তি, ত্বকের রঙের পরিবর্তন হয়ে যাওয়া, মুখে বা কোনো অংশে দীর্ঘদিন না শুকানো ঘা, জনডিস ইত্যাদি। এছাড়া শরীরের ওজন অত্যধিক ভাবে বেড়ে যাওয়া বা অত্যধিক ভাবে কমে যাওয়া ইত্যাদি বেশিরভাগ ক্যানসার রুগীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

তবে কিছু আবশ্যিক উপসর্গ যেমন— কোনো অংশে লাম্প, চিবানোর ক্ষেত্রে অসুবিধা, কোষ্ঠকাঠিন্য বা মলাশয়ের কোনো সমস্যা কিংবা মূত্রাশয় বা মূত্রঘটিত সমস্যা, অনেকদিন ধরে থেকে যাওয়া কফ্-কাশি, গলাভাঙা, কোনো জায়গায় রক্তপাত না থামা ইত্যাদি।

ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম মৃত্যুর কারণ হল ক্যানসার। যা অনেক রকমের হতে পারে। আমরা প্রায়ই শুনি কারসিনোমা, সারকোমা, লিউকেমিয়া ইত্যাদি শব্দগুলি। ৮০% বা ৯০% ক্যানসারই কারসিনোমা। যেখানে এপিথেলিয়াল কোশগুলি আক্রান্ত হয়। টার্গেট অরগানগুলি ফুসফুস, কোলন, ত্বক, স্তন, প্রস্টেট গ্রন্থি প্রভৃতি। ভারতে মূলত এই কারসিনোমার প্রকোপ অনেক বেশি।

অপরদিকে সারকোমা হল যোগকলায় হওয়া ক্যানসার। সেটি তরল, কঠিন বা অর্ধকঠিন যোগকলায় হতে পারে। যেমন তরলের মধ্যে রক্ত, অর্ধকঠিনের মধ্যে তরুনাস্থি বা কঠিনের মধ্যে হাড় ইত্যাদিতে ক্যানসার হতে পারে।

এছাড়া আছে অস্থিমজ্জার ক্যানসার যাকে বলে লিউকেমিয়া আর লিম্ফোমা হল শরীরের অনাক্রম্যতন্ত্রের ক্যানসার।

স্টেজ

শরীরের সমস্ত স্থানেই ক্যানসার হতে পারে। তবে স্টেজের মাধ্যমে ডাক্তাররা সহজে রোগীর বর্তমান অবস্থা বুঝতে পারেন। যাকে TNM শ্রেণিবিভাগ বলে। তবে সব ক্যানসার TNM-এর আওতায় পড়ে না।

TNM-এর অর্থে—

Tumor (T) : প্রাইমারী টিউমার হলে।

Nodes (N) : প্রাইমারী টিউমারের নিকটে লিম্ফ নোডগুলিতে হলে।

Metastasis (M) : প্রাইমারী টিউমার থেকে দূরবর্তী স্থানে যদি ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ে। এই TNM-এর চারটি স্টেজ হয়। যথা—

জিরো স্টেজ : যেখানে ক্যানসার কোশগুলি তার উৎসেই অবস্থান করে এবং অন্য কোশ বা অঙ্গকে আক্রমণ করে না।

প্রথম-তৃতীয় স্টেজ : এক্ষেত্রে টিউমারটি আকারে অনেক বৃদ্ধি পায় ও লিম্ফ নোড, কোশ তথা অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

চতুর্থ স্টেজ : এক্ষেত্রে টিউমারটি তার উৎস থেকে অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে। দূরবর্তী লিম্ফ নোড, অঙ্গ, কোশকলাগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ক্যানসারের প্রকৃত কারণ

বংশগত কারণ ছাড়াও এপিজেনেটিক কারণে ক্যানসার হতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন ভৌত উপাদান তো আছেই। কিছু প্রোটোঅঙ্কোজিন মিউটেশন যেমন— BRCA1, BRCA2 অথবা টিউমার সাপ্রেসর জিন p53, এদের মিউটেশন হলে, দীর্ঘদিন ধরে অতিবেগুনী রশ্মি কিংবা দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে আসলে, বিভিন্ন ভাইরাস যেমন— এপস্টেইন-বার, হেপাটাইটিস-B, C ভাইরাসের হেলিকোব্যাকটর পাইলোরির মতো সংক্রমণে ক্যানসার হতে পারে।

এছাড়া, খাদ্যাভ্যাস সঠিক না হওয়ার ফলে কিংবা দীর্ঘদিন ধরে ধূমপান বা মদ্যপান বা পোড়া খাবার বা অতি উচ্চ উষ্ণতায় তৈরি খাবার গ্রহণের ফলে, দীর্ঘদিন ধরে পোষণ করা স্থূলতা, কারসিনোজেন সমৃদ্ধ ফাস্টফুড অত্যধিক হারে খাদ্য তালিকায় থাকলে ক্যানসারের সম্ভাবনা অনেকাংশেই বেড়ে যায়।

এবার আসব কোশ বা জিন-এর মধ্যে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা যেটি ক্যানসার হওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণকে নির্দেশ করে।

আমরা বরাবরই জানি, প্রতিটি কোশ নিয়ন্ত্রিতভাবে বিভাজিত হয় এবং তাদের এই বিভাজনের সীমা নির্দিষ্টকরণের জন্য বিশেষ বিশেষ চেক পয়েন্ট প্রোটিন বর্তমান। আবার এই কোশের বৃদ্ধি কেন হবে তা নির্ভর করে বৃদ্ধি তথা বিভাজন নিয়ন্ত্রণকারী signal-এর ওপর, যাকে আমরা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলে থাকি Growth signal.

এই Growth signal সঠিকভাবে কাজ করার জন্য কোশের পর্দায় গ্রোথফ্যাক্টর তথা বৃদ্ধির উপাদানের গ্রাহক বর্তমান থাকে, যার সাথে growth factor যুক্ত হয় এবং সিগন্যাল ট্রান্সডাকশনের মাধ্যমে DNA-র মধ্যে অবস্থানকারী কোনো নির্দিষ্ট জিন নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করে। সেই প্রোটিন আবার এই কোশ বিভাজনে উদ্বুদ্ধ করে।

অনেক রকমের গ্রোথ ফ্যাক্টর আছে। যেমন— PDGF, TGFα ইত্যাদি। আবার গ্রোথ ফ্যাক্টরদের receptorগুলি tyrosine kinase receptor-এর মতো আচরণ করে।

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য ও ভয়ানক ব্যাপার এই যে, ক্যানসার কোশ এই স্বাভাবিক কোশের 'সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন'-কে নকল করে বা বলা যেতে পারে, 'মিমিক' করে। যেই কোশের কোশ বিভাজনের দরকার নেই সেই কোশও বিভাজিত হতে শুরু করে মিথ্যা সিগন্যালিং-এর বিভ্রান্তির পাল্লায়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, মস্তিষ্কের টিউমারে, এপিডারমাল গ্রোথ ফ্যাক্টর (EGF-R/erb13)-এর আপ-রেগুলেশন হয়।

এইরকম ভাবে, এক কোশ থেকে অপর কোশে ধনাত্মক (+)ve

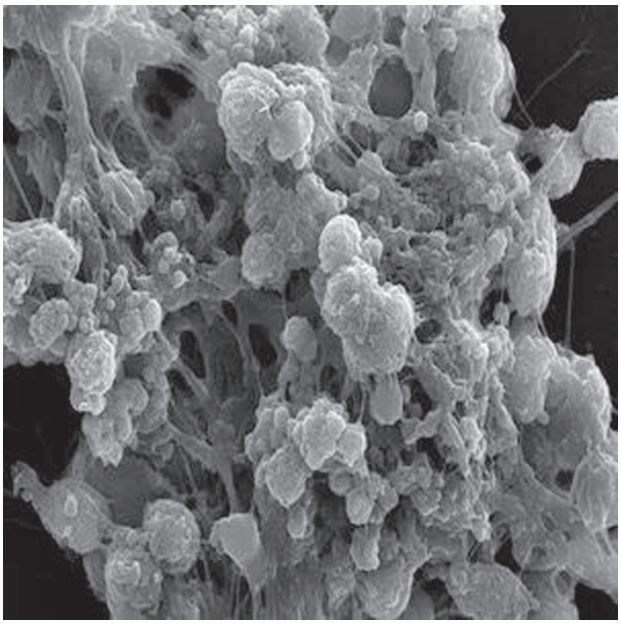

ফিডব্যাকের মাধ্যমে ক্রমাগত প্রলিফারেশন সিগন্যালিং পাঠাতে থাকে ও কোশগুলি একের পর এক বিভাজিত হতে থাকে। এক সময় কোশের বিভাজনের নির্ধারক সীমা 'Hay-flick' সীমাকে কোশেরা অতিক্রম করে কোশগুলি অমরত্ব লাভ করে।

এতক্ষণ কোশের কথা আলোচনায় উঠে এল, এবার আসব কর্কট রোগের পিছনে জিনগত ভূমিকার ওপর।

সব সময়ই খাদ্যখাবার বা রেডিয়েশন-এর জন্য ক্যানসার হবে তার কোনো মানে নেই। ক্যানসার কিন্তু বংশগত হতেও পারে। অর্থাৎ sporadic বা familial দুই ধরনের ক্যানসারই দেখতে পাওয়া যায়।

কিছু ভাইরাসের মধ্যে থাকা জিন মানুষের শরীরে আক্রমণ করে স্বাভাবিক কোশের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট করে দেয় যার ফলে ক্যানসার হতে পারে। মূলত এই ভাইরাস থেকে প্রাপ্ত জিন মানুষের শরীরে (হোস্ট) থাকা প্রোটো-অঙ্কোজিনকে অঙ্কোজিনে রূপান্তরিত করে। এরকম কিছু ভাইরাসের উদাহরণ হল রাউস-সারকোমা ভাইরাস, হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস যার সংক্রমণের ফলে এইডস্ হয় (HIV-I), এছাড়া FLV ভাইরাস ইত্যাদি।

সাধারণত কোনো শরীরে ক্যানসার হওয়ার জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণের মিউটেশন। মূলত চার ধরনের জিনের মিউটেশনের ফলে অত্যধিক হারে ক্যানসার রোগ হয়।

এদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে টিউমার সাপ্রেসর জিন ও প্রোটোঅঙ্কোজিন ও পরের দিকে আছে মাইক্রো আর-এন-এ জিন ও মিউটেটর জিন।

কোশের ভূমিকা ও জিনগত কারণের পর চলে আসা যাক কারসিনোজেনের ভূমিকায়। কারসিনোজেন কিন্তু এই আজকালকার

দিনের নয় এবং সেই অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে অর্থাৎ যখন মানুষ বাস্তবিক ভাবেই শিল্প, কারখানার ইত্যাদির সঙ্গে পেশাগত কারণে যুক্ত হয়েছে তখন থেকেই এই কারসিনোজেনের বাড়-বাড়ন্ত। কারসিনোজেন ছাড়াও দীর্ঘদিন ক্ষতিকারক বিকিরণের সংস্পর্শে এসেও মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে। যেমন দেখা গেছে দীর্ঘদিন ধরে উন্মুক্ত কৃষিক্ষেত্রে সূর্যালোকের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে কৃষকদের ত্বকের ক্যানসারের সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে গেছে।

আবার, যে সমস্ত শ্রমিক অ্যাসবেসটাস-এর সংস্পর্শে বা খনিতে দীর্ঘদিন কাজ করছেন তাদের ব্রঙ্কিয়াল ক্যানসার তথা ফুসফুসে ক্যানসারের ঝুঁকি অনেকাংশেই বেড়ে গেছে। এছাড়া ভিনাইল ক্লোরাইড যা শিল্পক্ষেত্রেই বেশিরভাগ ব্যবহৃত হয়, এর প্রভাবে যকৃতে ক্যানসারের মাত্রা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার আসি তামাকের কথায়। তামাক ও অস্বাস্থ্যকর খাবারকে ক্যানসার ঘটিত মৃত্যুর জন্য ৫০-৬০ শতাংশ দায়ী করা হচ্ছে। তামাক হল Pro-carcinogen। তামাক সাধারণত নিরীহ উদ্ভিদ। কিন্তু তামাকজাত পদার্থকে যখনই দাহ করা হচ্ছে বা গুঁড়ো করে খাওয়া হচ্ছে তখনই কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে এরা কারসিনোজেনে পরিণত হচ্ছে।

যেমন—কিছু অরগ্যানিক পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক যৌগ, যার মধ্যে পড়ছে জ্বলন্ত কাঠ, কয়লা, সিগারেটের দহনের ফলে উদ্ভূত ধোঁয়ায় থাকা যৌগ।

এছাড়া খাদ্য বিষক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন অ্যাফ্লাটক্সিন যা ছত্রাক দ্বারা খাবারে কন্টামিনেশন হওয়ার ফলে ঘটে থাকে। অপরটি হল ultimate carcinogen. অর্থাৎ pro-carcinogen-এর বিপাকক্রিয়ার ফলে যে কারসিনোজেনের সৃষ্টি হয়। এখন এই তৈরি হওয়া ultimate carcinogen কোশের মধ্যে থাকা বিভিন্ন উৎসেচকের গতিপথ বা কার্যকারিতা নষ্ট করে দিতে পারে। কিংবা ডি.এন.এ. (DNA)-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে মিউটেশন ঘটায়, সেই কারণে এদের মিউটাজেনও বলা হয়।

কারসিনোজেন ছাড়াও বিকিরণও এই মিউটেশন ঘটাতে পারে। বিখ্যাত নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী মাদাম কুরী রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম আবিষ্কার করতে গিয়ে সারাজীবন রেডিয়েশনের সংস্পর্শে থাকায় ক্যানসারে মারা যান। তবে এই বিকিরণ ছিল তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। এছাড়াও সূর্যালোক ঘটিত অতিবেগুনী রশ্মির (UV) বিকিরণ পিরিমিডিন ডাইমার গঠনের মাধ্যমে দ্বিতন্ত্রী DNA-র গঠন বদলে দেয়। ফলস্বরূপ DNA-র প্রতিলিপির গঠন হতে না পেরে সমগ্র কোশটি মারা যায়। UV রশ্মির প্রভাবে হওয়া ত্বকের ক্যানসারের নাম জেরোডারমা পিগমেনটোসাম।

এছাড়া যে সমস্ত মানুষ পেশাগত কারণে দীর্ঘদিন X-রশ্মি সংস্পর্শে আসেন, তাদের ক্ষেত্রে X-রশ্মির বিকিরণ কারসিনোজেন হিসেবে কাজ করে।

রেডিয়েশন প্রধানত দুই প্রকারের হয়। যথা আয়োনাইজিং রেডিয়েশন ও নন-আয়োনাইজিং রেডিয়েশন। আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের মধ্যে পড়ছে এক্স-রে, কসমিক রশ্মি, রেডন ইত্যাদি যারা সরাসরি মিউটেশন বা পরিব্যক্তি ঘটাতে পারে। লিউকেমিয়া ও থাইরয়েড ক্যানসারের জন্য এই আয়োনাইজিং রেডিয়েশন দায়ী। আর নন-আয়োনাইজিং রেডিয়েশন-এর মধ্যে পড়ছে অতিবেগুনী রশ্মি যার প্রভাব ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে।

এবার চলে আসা যাক এই কর্কট রোগের চিহ্নিতকরণে, অর্থাৎ ডায়াগনোসিসে। যেটি ছাড়া ডাক্তারের পক্ষে ক্যানসার হয়েছে কি হয়নি বা হলেও কতটা গভীরে রোগের বিস্তার তা জানা একেবারেই সম্ভব নয়।

প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির ফলে বিভিন্ন রকম ইমেজিং টেস্ট আবিষ্কার হয়েছে যেমন— CT স্ক্যান MRI, PET, স্ক্যান ইত্যাদি। এছাড়াও বায়োপ্সি টেস্টের মাধ্যমে কোশগুলির (ক্যানসার) উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ধরা পড়ে। এছাড়া গবেষণাগারে মূত্র ও রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে কিংবা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে কোশগুলির বিভিন্ন রকমের আকার ও আয়তন ক্যানসার কোশ চিনতে সাহায্য করে।

তবে বায়োপ্সি টেস্টের মাধ্যমে ক্যানসার তথা কর্কট রোগের সুনিশ্চিত ডায়াগনোসিস করা যায়। কর্কট রোগের চিকিৎসা নির্ভর করে রোগের ভয়াবহতা ও কোন্ ধরনের ক্যানসার রোগ হয়েছে তার ওপর। সাধারণত ক্যানসারের চিকিৎসা হিসাবে বেছে নেওয়া হয় সার্জারি, রেডিয়েশন এবং কেমোথেরাপির ওপর। এছাড়াও বর্তমানে হিমাটোপয়েটিক স্টেমকোশের পুনস্থাপন, অ্যানজিওজেনেসিস প্রতিরোধক ক্রায়োসার্জারি বা ফোটোডাইনামিক থেরাপির সাহায্যে ক্যানসারের প্রাদুর্ভাব কিছুটা হলেও কমানো যেতে পারে।

বর্তমানে ক্যানসারের চিকিৎসা অনেক উন্নত হয়েছে। কেমোথেরাপি বা ইমিউনোথেরাপির পর এসেছে প্রোটিন বা পেপটাইড থেরাপি। যেখানে p28 পেপটাইড বা azurin প্রোটিনের মাধ্যমে ক্যানসার কোশগুলিকে বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। সিউডোমোনাস ব্যাকটেরিয়ার থেকে এই প্রোটিন (অ্যাজিউরিন) সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভবিষ্যতে ভোজ্য খাবার যেমন ফল বা সবজির মাধ্যমে জৈব প্রযুক্তির প্রয়োগে ক্যানসার প্রতিরোধক ফল বা সবজি তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

লেখক জীবন বিজ্ঞান শিক্ষিকা ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: kamalinibanerjee842@gmail.com

ডা. শঙ্কর কুমার নাথ

ক্যান্সার থেকে বাঁচতে কি খাব কি খাব না?

খাদ্যের সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্যান্সারের যোগাযোগ বেশ প্রগাঢ়। বেশ কিছু খাদ্য যেমন ক্যান্সার উৎপাদনে সাহায্য করে, তেমনই এমন অনেক খাদ্যই রয়েছে যা ক্যান্সার প্রতিরোধক।

আজ আমরা টাটকা সজীব শাকসবজী, টাটকা মাছ, স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জল পাই না বললেই চলে। শস্যদানা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে মারাত্মক সব রাসায়নিক সার, যার মধ্যে প্রায় সবগুলিই ক্যান্সার-উৎপাদক পদার্থ। বহু খাদ্যবস্তুই নানান পরিবেশদূষণকারী পদার্থ দ্বারা দূষিত থাকে, সেগুলি খাওয়ার আগে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ধোওয়া হয় না। পানীয় জলও নানা ক্যান্সার-উৎপাদক পদার্থের (Carcinogen) উপস্থিতিতে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সর্বোপরি রয়েছে গরিব দেশে সুষম খাদ্য গ্রহণের অভাব। ফলস্বরূপ সঠিক মাত্রায় প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, খনিজ লবণ এবং ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের অভাবে মানুষের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। যার ফলে, প্রতিনিয়ত ভোজ্য হিসাবে গ্রহণ করা নানান কারসিনোজেনের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না।

কারসিনোজেন (Carcinogen) বা ক্যান্সার উৎপাদক পদার্থ কী?

কারসিনোজেন নানা ধরনের যৌগ বা পদার্থ, যা আমাদের শরীরে ক্রিয়া করে সুস্থ কোষকলাকে ক্যান্সার কোষকলায় পরিণত করতে সাহায্য করে। এমন শয়ে শয়ে কারসিনোজেনকে প্রতিহত করা কিংবা এর থেকে দূরে থাকা অথবা এগুলির সৃষ্টিতে বাধা দেওয়ার কাজটা আমরা যথাযথভাবে করতে পারলে ক্যান্সারকে যে প্রতিরোধ করতে পারব, তাতে সন্দেহ নেই।

খাদ্যের মাধ্যমে ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে গেলে আমাদের দুভাবে ভাবতে হবে : (১) খাদ্য যখন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় এবং (২) খাদ্য যখন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

১. খাদ্য যখন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়

চর্বিজাতীয় খাদ্য : আফ্রিকার প্রত্যন্ত গ্রামের বান্টু উপজাতিদের মধ্যে, শিল্পাঞ্চলের মানুষদের চেয়ে ক্যান্সারের প্রকোপ কম। আসলে দেখা গেছে, এই বান্টু উপজাতি সমাজে অতি অল্প Fat বা চর্বিযুক্ত খাদ্য এবং প্রচুর Fibre বা আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করবার রীতি রয়েছে। জাপান এবং ফিনল্যান্ডকে বাদ দিলে দেখা যাচ্ছে, যে দেশ যত বেশি শিল্পে উন্নত, সে-দেশে খাদ্য থেকে ক্যান্সারের ঝুঁকি তত বেশি। এই ক্যান্সারগুলি সাধারণত Colon বা বৃহদন্ত্র, Rectum বা মলাশয়, Breast বা স্তন, Uterus বা জরায়ু এবং Prostate বা প্রস্টেট গ্রন্থির ক্যান্সার। শিল্পোন্নত দেশগুলির মানুষ বেশি পরিমাণে চর্বিযুক্ত খাবার খেয়ে থাকে, যা শিল্পে অনুন্নত দেশের মানুষেরা করে না।

নুন এবং নুনে সংরক্ষিত খাদ্য : নুন বা লবণকে অনেকে মনে করেন ক্যান্সার সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। লবণ দ্বারা সংরক্ষিত খাদ্য দিনের পর দিন খেলে পাকস্থলী এবং খাদ্যনালীতে ক্যান্সার সৃষ্টি হচ্ছে।

ফাস্ট ফুড (Fast Food) : ফাস্ট ফুডে সাধারণত চর্বি জাতীয় খাদ্য বেশি থাকে, পরিমাণে সোডিয়াম লবণও বেশি থাকে, কিন্তু আঁশযুক্ত খাবার থাকে পরিমাণে অতি অল্প, এমনকী অল্প থাকে ক্যালসিয়াম লবণও। তাই শুধু ক্যান্সার নয়, ঝুঁকি বাড়ে হৃদরোগের, ঝুঁকি বাড়ে হাড়ক্ষয়জনিত রোগেরও।

রেড মিট : পাঁঠা, খাসি, গরু, শূকর ইত্যাদির মাংসকে সাধারণভাবে রেড মিট বলা হয়। নিয়মিত রেড মিট গ্রহণে বৃহদন্ত্র এবং মলাশয়ের ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খাদ্যে সংরক্ষক বা সংযোজক মিশ্রণ : নাইট্রেট দিয়ে খাদ্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা অনেক দিনের। সাধারণত সোডিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হয়। এই যৌগটি মাংসের সঙ্গে মেশালে মাংসকে বহুক্ষণ টাটকা রাখা যায়— রন্ধন করা মাংসও অনেক বেশি সজীব লাগে। অন্যান্য অনেক খাদ্যবস্তুই নাইট্রেট দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। নাইট্রেট যৌগটি নাইট্রাইটে পরিণত হয় এবং সেটা চূড়ান্তভাবে পাকস্থলীতে নাইট্রোসামাইন যৌগে পরিবর্তিত হয়, যেটি একটি কারসিনোজেন বা ক্যান্সার উৎপাদক পদার্থ। এর থেকেই পাকস্থলীতে ক্যান্সার হচ্ছে।

ছাতা (Fungus) পড়া খাদ্য : অনেক সময় বাদাম জাতীয় খাদ্যদ্রব্যগুলির উপর ছাতা পড়ে যায়, এর নাম অ্যাসপারগিলাস

ফ্লেভাস (Aspergillus flavus)। এই ছাতার মধ্যে থাকে আফলাটক্সিন (Aflatoxin) নামে একটি শক্তিশালী কারসিনোজেন, যা লিভার

ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।

কীটনাশক পদার্থ থেকে : বিভিন্ন কীটনাশক পদার্থ, যেমন DDT, Aldrin, CCl_4, Arsenic, Vinyl Chloride ইত্যাদির যথেচ্ছ ব্যবহারে খাদ্যবস্তু দূষিত হচ্ছে, আর যার ফলস্বরূপ ক্যান্সার রোগের ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে গেছে।

খাদ্যে সংযোজকের (Additive) মিশ্রণ : সংযোজক হিসেবে খাদ্যে মিশ্রিত বস্তুর কিছু কিছু সাংঘাতিক কারসিনোজেন বলে মনে করা হচ্ছে। খাদ্যবস্তুকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করার জন্য বেশ কিছু সংযোজক মেশানো হয়, যার অধিকাংশই ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। এগুলি হল, বিভিন্ন রঙ, যেমন মেটানিল ইয়েলো (বোঁদে, বিরিয়ানী, জিলিপি, কমলাভোগ বা ঘুগনিতে কখনো কখনো মেশানো হয়), আয়রণ অক্সাইড, লেড ব্রোমেট ইত্যাদি। এসব থেকে পাকস্থলী বা বৃহদন্ত্রের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ছে। এখন আবার বাজার ছেয়ে গেছে চাওমিন নামে এক ধরনের খাবারে। অতি আকর্ষণীয় এবং সুস্বাদু করার জন্য এর মধ্যে প্রায়ই মেশানো হচ্ছে জনপ্রিয় একটি পদার্থ। এর নাম আজিনো মটো (মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট)। জেনে রাখুন, এই পদার্থটি একটি সক্রিয় কারসিনোজেন।

আগুনে ঝলসানো খাদ্য (Smoked Food) : অনেক সময় আমরা মাছ, মাংস বা অন্যান্য সবজীযুক্ত খাবারকে আগুনে ঝলসে নিয়ে অর্থাৎ খাদ্যবস্তুকে ঝলসে বাদামী রঙে বা প্রায় পুড়িয়ে নিয়ে খেতে পছন্দ করি। এই ক্ষেত্রে কারসিনোজেন হল পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, যা ওই খাদ্যবস্তুর উপরিতলে জমা হয়।

পানীয় : অত্যধিক মদ্যপান যে মুখগহ্বরের, কণ্ঠনালীর, খাদ্যনালীর, অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি কিংবা লিভার ইত্যাদির ক্যান্সার সৃষ্টির ঝুঁকি বাড়াচ্ছে, তা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। মহিলাদের মধ্যে যারা খুব বেশি মদ্য পান করে থাকেন, তাদের স্তন ক্যান্সারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কফি খুবই জনপ্রিয় পানীয়। কিন্তু এই পানীয় থেকে মূত্রথলির ক্যান্সার হতে পারে বলে গবেষকগণ মনে করছেন।

জল : জলে কখনো কখনো কিছু কিছু কারসিনোজেনের উপস্থিতি বেশ কিছু ক্যান্সার সৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি করে। দেখা গেছে, জলে মিশ্রিত ট্রাইহ্যালোমিথেন, পরিপাকতন্ত্র এবং মূত্রথলির ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। আবার, জলে যখন আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, নিকেল, অ্যাসবেসটস ইত্যাদি দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকে (যেগুলি সবই পরিচিত কারসিনোজেন), তখন সেই জল থেকে ক্যান্সারের প্রবণতা যে বাড়ে, তাতে সন্দেহ নেই। খুব গরম পানীয় খাওয়ার অভ্যেস থেকে খাদ্যনালীর ক্যান্সারের ঝুঁকির কথাও বলা হচ্ছে বেশি কিছু গবেষণায়।

২. খাদ্য যখন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে

ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ই সহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থযুক্ত, বিশেষ করে সেলোনিয়ামযুক্ত ফলমূল, শাকসবজী ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু ক্যান্সার প্রতিরোধ করছে বিভিন্নভাবে।

ক্যান্সার প্রতিরোধী কিছু খাদ্যবস্তু : লেবু জাতীয় ফল, টমেটো সবুজ শাকসবজী, আলু, পেয়ারা, আমলকি (ভিটামিন-সি-এর ভাণ্ডার), টমেটো, দুধ, ডিম, সবুজ শাকসবজী, আম, অন্য শাকসবজী, লাল গাজর, নটে শাক, মুলো (সবই ভিটামিন-এ-তে সমৃদ্ধ); বেশ কিছু শাকপাতা, উদ্ভিজ্জ তেল, শস্যদানা, মায়ের দুধ, বাদাম (এসবে ভিটামিন-ই রয়েছে)।

টমেটোর মধ্যে উপস্থিত লাল রঞ্জক পদার্থ লাইকোপিন (Lycopene) সুস্থ কোষকে ক্যান্সার কোষে পরিণত হতে বাধা দেয়।

অন্যান্য সবজীর মধ্যে বাঁধাকপি, ফুলকপি, সবুজ ফুলকপি ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে ইনডোল-3 কারবিনল (Indole-3-Carbinol), যা স্তন ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে।

যারা প্রচুর মাছ খেয়ে থাকেন, বিশেষ করে মাছের তেল, তাদের মধ্যে মুখগহ্বর, কণ্ঠনালী, পাকস্থলী, মলাশয়, স্তন, বৃহদন্ত্র, ফুসফুস, অগ্ন্যাশয় এবং প্রস্টেস্ট গ্রন্থির ক্যান্সার হবার প্রবণতা কমে যায়। মাছের মধ্যে পাওয়া যায় ওমেগা-3 ফ্যাটি

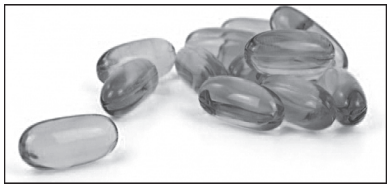

অ্যাসিড (Omega-3 fatty acids), যা এইসব ক্যান্সার থেকে মানুষকে রক্ষা করে। শিম-এর মধ্যে থাকে আইসোফ্লেভোন (Isoflavones), যা কিছু কিছু ক্যান্সার জিনকে ধ্বংস করতে পারে, যে-জিন সুস্থ কোষকে ক্যান্সার কোষে পরিবর্তনের বার্তা বহন করেন।

সোয়াবিনের মধ্যে থাকে প্রোটিয়েজ ইনহিবিটার (Protease Inhibitors), যা ক্যান্সার সৃষ্টির শুরুর দিকে সুস্থ কোষকে ক্যান্সার কোষে

পরিবর্তন হওয়া বন্ধ করে। সোয়াবিন থেকে বৃহদন্ত্র, স্তন, প্রস্টেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে।

শসার মধ্যে, বিশেষ করে শসার ছালে, পাওয়া যায় স্টেরলস্ (Sterols) যেটি গ্রহণ করলে শরীরের কোলেস্টেরল কমে, ফলে চর্বিও কমে এবং এই কারণে ঝুঁকি কমে বৃহদন্ত্র, মলাশয়, স্তন, প্রস্টেস্ট, জরায়ুর ক্যান্সারের। সুতরাং শসা খেতে হবে ছাল সমেত।

রসুন এবং পেঁয়াজ গ্রহণে পাকস্থলী এবং পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে যায়। পাকস্থলীতে সাধারণভাবে পরিপাকের কারণে নাইট্রোসামিন নামক যে-কারসিনোজেন উৎপন্ন হয়ে থাকে, সেগুলিকে নষ্ট করে দেয় পেঁয়াজ এবং রসুন।

হলুদের মধ্যেও রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধক যৌগ, যার নাম কারকিউমিন প্রতিরোধ করে। সবুজ চায়ের মধ্যে পাই ক্যাটেচিন্স্ (Catechis) নামক ক্যান্সার প্রতিরোধক পদার্থ। আঙুরের মধ্যেও থাকে ক্যান্সার প্রতিরোধক রাসায়নিক, নাম রেসভেরাট্রল (Resveratrol), যা লসিকাগ্রন্থি, পাকস্থলী এবং স্তন ক্যান্সার সৃষ্টিতে বাধা দেয়।

আঁশ বা ছিবড়েযুক্ত খাদ্য : 1960 সালে র্জজ ওয়েটেল (George Oettle) নামক একজন গবেষক প্রথম আমাদের জানালেন যে, আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণের সঙ্গে বৃহদন্ত্র (Colon) ক্যান্সার কমে যাবার

এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামে বান্টু উপজাতির উপর গবেষণা করছিলেন। এরা প্রচুর পরিমাণে আঁশযুক্ত খাদ্য খেয়ে থাকে। চিকিৎসক ডেনিস বার্কিট (Denis P. Burkitt) উগান্ডায় দেখলেন যে, সেখানকার মানুষ প্রচুর পরিমাণে আঁশ আছে এমন খাদ্য খায় বেশি। এদের খাদ্য তালিকায় চীনাবাদাম (ground nut), মিষ্টি আলু (Sweet potato), রাঙা আলু (Yams), কলা, ছালসহ প্রচুর শাকসবজি ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় প্রতিদিন আঁশ বা তন্তুর পরিমাণ থাকতো 50 থেকে 250 গ্রামের মতো। লক্ষ্য করলেন, এদের বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার হয় না বললেই চলে। প্রচুর আঁশযুক্ত খাদ্য খাওয়ার কারণে এদের খাদ্য গলাধঃকরণ করা থেকে পায়খানা করার মধ্যে সময়ের ব্যবধানও অনেক কমে যায়। আর এই কারণে পরিপাকতন্ত্রের মধ্যে শক্ত বর্জ্য পদার্থ খুব বেশিক্ষণ অবস্থান করার সুযোগ পায় না। খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত কিছু পদার্থ, যা শরীরে বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে, সেগুলি খুব তাড়াতাড়িই শরীর থেকে নির্গত হয়ে যায়।

খাদ্যে অবস্থিত চর্বিজাতীয় পদার্থের সহায়তায় পৌষ্টিক নালীতে অবস্থিত জীবাণুগুলি পৌষ্টিক নালীর ভিতরে প্রচুর ক্যান্সার উৎপাদক পদার্থ বা কারসিনোজেন তৈরি করে ফেলে। এই কারসিনোজেন এবং শরীরের পিত্তরসের Bile acids উভয় মিলেই বৃহদন্ত্রে সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা নেয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ওই উপজাতি মানুষগুলির ক্ষেত্রে এই ক্ষতিকারক পদার্থগুলি খুব তাড়াতাড়ি শরীর থেকে নির্গত হয়ে যাচ্ছে তো বটেই, এমনকি পায়খানার পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে এগুলি অনেকটাই লঘু হয়ে যাচ্ছে।

কি করবেন আর কি করবেন না :

(১) খাদ্যবস্তু বেশি জলে ডুবিয়ে রান্না করবেন না। যত কম জলে রাঁধবেন, ভিটামিন-সি তত বেশি খাদ্যে ধরে রাখা সম্ভব হবে। এই কারণে ভিটামিন-সি যুক্ত খাদ্যবস্তু যেমন, আলু, বাঁধাকপি, সবুজ ফুলকপি, পালং শাক ইত্যাদি খুব অল্প জলে, অল্প সময় ধরে রাঁধতে হবে। এছাড়া ভিটামিন-সি বাতাসে খুলে রাখলেই বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

(২) চেষ্টা করুন খাদ্যবস্তুকে না কেটে গোটা রেখে রাঁধতে। রাঙা আলু গোটা রাঁধলে 89% ভিটামিন-সি ধরে রাখা যায়।

ক্যান্সার প্রতিরোধী খাদ্য— নির্দেশাবলী :

(১) এমন সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন যাতে শরীরের ওজন স্বাভাবিক থাকে। (২) অতিরিক্ত ক্যালোরি প্রতিদিন কমিয়ে স্বাভাবিক করুন। (৩) চর্বিজাতীয় খাদ্য কম করে খান। (৪) বেশি করে মাছের তেলসহ মাছ খান, যেখানে প্রচুর ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। (৫) পোলট্রির মাংস খান চর্বি ছাড়া। (৬) রেডমিট খাওয়া কমিয়ে ফেলুন। (৭) প্রচুর পরিমাণে আঁশযুক্ত খাদ্য খান। প্রতিদিন স্বাভাবিকভাবে ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন হয় 25 থেকে 35 গ্রাম আঁশ বা ছিব্ড়ে। (৮) প্রতিদিনকার খাবারে রাখবেন ফল, মূল, শাকসবজী, শস্য, যাতে অবশ্যই থাকবে ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ। (৯) অত্যধিক লবণ এবং খাদ্য সংরক্ষক ও সংযোজক ত্যাগ করুন। (১০) অতিরিক্ত ঝলসানো খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। (১১) কফি কম খান, চা খেতে পারেন। (১২) মদ্যপান একেবারে কমিয়ে ফেলুন। (১৩) অত্যধিক গরম অবস্থায় কোনো খাদ্য গ্রহণ করবেন না।

লেখক ক্যানসার বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

E-mail : sankarku_nath@yahoo.co.in • M. : 9433309056

অ জ য় ম জু ম দা র

ক্যানসার সারাবে সিউডোমোনাস ব্যাকটিরিয়া

সিউডোমোনাস ব্যাকটিরিয়া

ড. আনন্দমোহন চক্রবর্তী

ক্যানসার নিয়ে ভাবনা বহুদিনের। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা লেগে পড়েছেন ক্যানসার গবেষণা নিয়ে। সমাধা সূত্র আজও বের হয়নি। কি এমন রোগ! এ'রোগ হলে আগে তো মানসিক বিকারেই অনেকে মারা যেত। বর্তমানে নিদারুণ অর্থ সংকটে ভুগতে থাকা এদেশের মানুষের অর্থনীতির সঙ্গে চিকিৎসা খরচের কোনো সাযুজ্য নেই। সেজন্য পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির মানুষদের ক্যানসারের চিকিৎসা করানো কঠিন। তাই অঙ্কুরেই জীবন যুদ্ধে পরাজিত হতে হয়। ঠিক এই সময়ের সন্ধিক্ষণে ডঃ আনন্দ মোহন চক্রবর্তীর ব্যাকটিরিয়া থেরাপি ক্যানসার নিরাময়ে ভীষণ ভাবে কার্যকরি হবে। গরীব মানুষের হাতে যেন অমরত্বের চাবি এসে গেল। ডঃ চক্রবর্তী কোন ক্যানসার গবেষক নন। ক্যানসার নিয়ে কোন দিন গবেষণা করবেন এমন কথা ভাবেননি। কিন্তু ঘটনা চক্রে সিউডোমোনাস ব্যাকটিরিয়া নিয়ে দীর্ঘ দিন কাজ করার সুবাদে তাকে এই ক্যানসার আবিষ্কারের আলোকে উদ্ভাসিত করে দিল। তার আবিষ্কার সঠিক। তবে কীভাবে মানুষের দেহে প্রয়োগ করা হবে সেটাই নতুন গবেষণার দিশা হবে। সিউডোমোাস নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করে নানা সময়ে নানা যুগান্তকারী কাজ করেছেন। কখনও সমুদ্রজলে তেল পড়ে মাইলের পর মাইল সামুদ্রিক প্রাণীদের বাঁচার প্রতিকূলতাকে সুপার বাগ ছড়িয়ে দিয়ে সমাধান করেছেন। কখন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খনির আকরিক থেকে কপারকে পৃথক করে শত শত কোটি টাকা সাশ্রয় করেছেন। সবই হল ব্যাকটিরিয়ার ভেলকি। প্রকৃতিতে পাওয়া সিউডোমোনাস ব্যাকটিরিয়ায় ডি এন এ-র সামান্য পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই অসাধ্য সাধন করে তুলছেন। আর একই পদ্ধতিতে ক্যানসার নিরাময় করার বীজ মন্ত্র পেয়ে গেলেন। এবার এ প্রসঙ্গে আলোচনায় আসা যাক— সিউডোমোনাস ব্যাকটিরিয়া শুধু প্রকৃতিতেই থাকে না। মানুষের শরীরেও বাসা বাঁধে। উনি লক্ষ করলেন এই সিউডোমোনাস ব্যাকটিরিয়া ক্যানসার প্রতিরোধে সক্ষম। শুরু হয়ে গেল গবেষণা। আসলে বিজ্ঞানীদের প্রয়োজন একটা ক্লু। সেটা পেলেন। এবার মন দিলেন কী ভাবে ক্যানসার সংক্রমণকে ধ্বংস করে। তার গবেষণা থেকে বেরিয়ে বলেন সিউডোমোনাস ব্যাকটিরিয়া এক ধরনের প্রোটিন তৈরি করে। রাসায়নিক নাম— কিউপেরোডক্সিন। চলতি নাম— অ্যাজিউরিন।

এই প্রোটিনই ক্যানসার কোশকে ধ্বংস করে দেয়। অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও জানতেন ব্যাকটিরিয়া ক্যানসার আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু যে ব্যাকটিরিয়া এই কাজ করবে সে আবার নানা রকম ক্ষতি করতেও ছাড়বে না। এ'কথা ভেবেই এ গবেষণা সুদূর প্রসার হয়নি। ডঃ চক্রবর্তীর সিউডোমোনাস ব্যাকটিরিয়া মানুষের ব্যাকটিরিয়া থেরাপি ক্যানসার নিরাময়ের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি কার্যকারি হবে। সিউডোমোনাস এরুজিনোসা-ই অ্যাজুইরিন প্রোটিন তৈরি করতে পারে। কৃত্রিম পদ্ধতিতে অ্যাজুইরিন তৈরি করা যায় কি— তা নিয়ে সাফল্যের কোন গবেষণার কথা জানা যায়

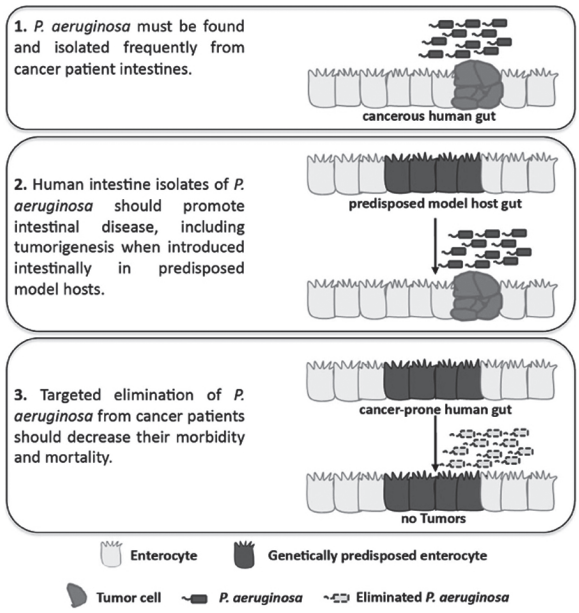

না। সিউডোমোনাসের এরুজিনোসা প্রজাতির ডি এন এ গুলি যদি সিউডোমোনাসের অন্য প্রজাতির দেহে ট্রান্সপ্লান্ট বা প্রতিস্থাপন করা যায় তা হলে সে ক্যানসার কোশ ধ্বংস করতে সক্ষম হবে। সুতরাং ব্যাকটিরিয়া ল্যাবরেটরীতে কালচার করার পর ক্যানসার আক্রান্ত মানুষের দেহে প্রবেশ করাবার প্রযুক্তি মানুষের করায়ত্ত করা প্রয়োজন। এই নতুন পদ্ধতির নাম দেওয়া যেতে পারে ব্যাকটিরিয়াথেরাপি।

২০১০ সালে গুজরাট বায়োটেকনোলজি মিশন এর এক অধিকর্তার প্রস্তাবে ব্যাকটিরিয়াকে ওষুধের ফর্মে আনার কাজ শুরু করেন ডঃ চক্রবর্তী। ডঃ চক্রবর্তীর এই সিউডোমোনাস ব্যাকটিরিয়ার গবেষণা ক্যানসার আক্রান্ত মানুষের বাঁচার আলো দেখাবে। সঙ্গে এদের পরিবারের হাতেও আসবে আশার আলো। অর্থনীতিতে আসবে নতুন

দিশা। ডঃ চক্রবর্তী আমাদের রাজ্যেরই বীরভূম জেলার কৃতি ছাত্র। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে রসায়নে যান্মানিক স্নাতক হন। তার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ থেকে বায়োকেমিস্ট্রিতে এম. এসসি পাশ করে আমেরিকার একটি ইলেকট্রনিক কোম্পানির পলিউশনাল কনট্রোল গবেষণাগারে গবেষক হিসাবে নিয়োগপত্র পান। সারা জীবনই প্রায় ব্যাকটিরিয়া নিয়ে কাটল। বিশেষ করে প্রকৃতিতে পাওয়া সিউডোমোনাস ব্যাকটিরিয়া নিয়ে। তাঁর তৈরি প্রযুক্তি দিয়ে অনেক সাফল্য এসেছে। বিশেষ করে আর্সেনিক ব্যাকটিরিয়া। আর্সেনিক ব্যাকটিরিয়ায় সাফল্য দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সারা পৃথিবীতে আর্সেনিক আক্রান্তের সমস্যা ভীষণ বেড়ে গেছে। আর আর্সেনিক আক্রান্ত হলে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে ভীষণভাবে। আসলে ডঃ আনন্দ মোহন চক্রবর্তী-র মূল গবেষণা হল 'ওল্ড ওয়াইন ইন এ নিউ বটল' অর্থাৎ প্রকৃতিতে পাওয়া ব্যাকটিরিয়ায় নিউক্লিয় পদার্থকে প্রতিস্থাপন করেন। বলাটা যত সহজ কাজটা কিন্তু ততটা সহজ নয়। সব নিউক্লিয় পদার্থ সব খোলকে সমান ভাবে অভিযোজিত করতে পারে না। কীভাবে সে নিজের মতো করে বেড়ে উঠবে এবং তার গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলির বিস্তার ঘটাবে এটাই তো গবেষণা। নতুন গবেষণায় ক্যানসার রোগিদের কোয়ালিটি অফ লাইফ' দীর্ঘ মেয়াদী হবে। ক্যানসার আর সব রোগের মতো আতঙ্কের থাকবে না। ডঃ চক্রবর্তী হাইড্রোকার্বন খাওয়া ব্যাকটিরিয়াকে আবিষ্কার করে ১৯৮৯ সালে আলাস্কার কাছে সমুদ্রে ভেসে থাকো তেল যে ভাবে ব্যাকটিরিয়া দিয়ে পরিষ্কার করে ছিলেন— তা বুঝিয়ে দিয়েছে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে কি অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করতে পারেন। সেই ব্যাকটিরিয়াও ছিল সিউডোমোনাস ব্যাকটিরিয়া। ডঃ চক্রবর্তী-র কাজে সামান্য জীবানুকে জাগিয়ে তুলে তাকে দিয়ে অসম্ভব সব কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে বা হবে। অর্থাৎ সীমার মাঝে অসীম হবে। পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অঙ্গীকার। প্রতিটি সুস্থ মানুষের শরীরেই রয়েছে অনেক গুলি করে ক্যানসারের জিন। সুস্থ শরীরে এরা চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকে। কোন কারণে এই জিনে যদি একটা বা দুটো ক্ষারের পরিবর্তন ঘটে যায় তখনই এদের ঘুম ভেঙে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারপরই তারা এমন সব প্রোটিন তৈরির হুকুম দেয় ফলে অনিয়মিত কোশ বৃদ্ধি ঘটতে থাকে দ্রুতলয়ে। অনেক সময়ই সুস্থ কোশও ক্যানসার কোশে পরিণত হয়ে যায়। ক্যানসার কোশ একবার পরিণত হয়ে গেলে স্বাভাবিক কোশ থেকে অনেক তাড়াতাড়ি কোশ বিভাজন হতে থাকে।

দিনে দিনে ক্যানসার আক্রান্ত কোশ বাড়তেই থাকে। তখন মৃত্যুর দিকে একটু একটু করে মানুষ এগিয়ে যেতে থাকে। এখানে ডঃ আনন্দ মোহনের সিউডোমোনাস এরুজিনোসা ব্যাকটিরিয়ার কৃতিত্ব এই যে ব্যাকটিরিয়াগুলির তৈরি প্রোটিন ডি এন এ-র ক্ষারের পরিবর্তনে বাধা দেয়। ফলে নতুন করে আর ক্যানসার কোশ পরিণত হতে দেয় না। তাছাড়াও ক্যানসার আক্রান্ত কোশগুলিকেও ধ্বংস করে থাকে।

সিউডোমোনাস ব্যাকটিরিয়া প্লাসমিডে ডঃ চক্রবর্তী পেলেন অদ্ভুত জিন। সেই জিনজাত উৎসেচক ভেঙে দিতে পারে পেট্রোলিয়ামের হাইড্রোকার্বনকে। সিউডোমোনাসের ক্ষিদে মেটাতে হাইড্রোকার্বন সাধারণত জল, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও শক্তিতে পরিণত হয়ে যায়। নানা জাতের সিউডোমোনাসের প্লাসমিডে লুকিয়ে আছে বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন ভাঙ্গার রহস্য। ডঃ চক্রবর্তী এরকমই কিছু সিউডোমোনাস ব্যাকটেরিয়া থেকে বিশেষ হাইড্রোকার্বন ভাঙা প্লাসমিডকে পৃথক করেছিলেন। সেই পৃথক করা প্লাসমিডগুলিকে সাধারণ একটি সিউডোমোনাস ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করিয়ে আকাঙ্ক্ষিত কাজে ব্যবহার করেছিলেন।

ক্যানসার কোশকে সিউডোমোনাস ব্যাকটিরিয়া যখন ধ্বংস করতে পারে তখন এই গবেষণার জন্য ডঃ চক্রবর্তীর পাশে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের থাকা খুব জরুরি। পৃথিবীর জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ডঃ চক্রবর্তীর যুগান্তকারী আবিষ্কারকে গুরুত্ব দিলে মানব জাতির অসম্পূর্ণ এক কাজ সম্পূর্ণ হবে আমরা এ আশা রাখি।

লেখক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: majumderajay@gmail.com, M. 8918824281

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা প্রকাশ

১৫ জানুয়ারি ২০২৩ : বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার ২০ তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান : কলকাতা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাঘরে বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান লেখক ও বিজ্ঞান গবেষক ও বিজ্ঞান কর্মীরা উপস্থিত হয়েছেন

অ জ য় ম জু ম দা র

টি-সেলের রিসেপ্টর সব ক্যান্সার সারাতে পারে

গবেষক অধ্যাপক এন্ড্রু সিওয়েল বিবিসি কে বলেছেন একটা কোশ দিয়ে সব ক্যান্সারের চিকিৎসার সম্ভবনা বাড়িয়ে দিয়েছে। যেটাকে ইংরেজিতে বলে 'ওয়ান সাইজ ফিটস অল' (one size-fits-all) সংক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কাজ করে। এই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা টিউমারের উপর কাজ করে।

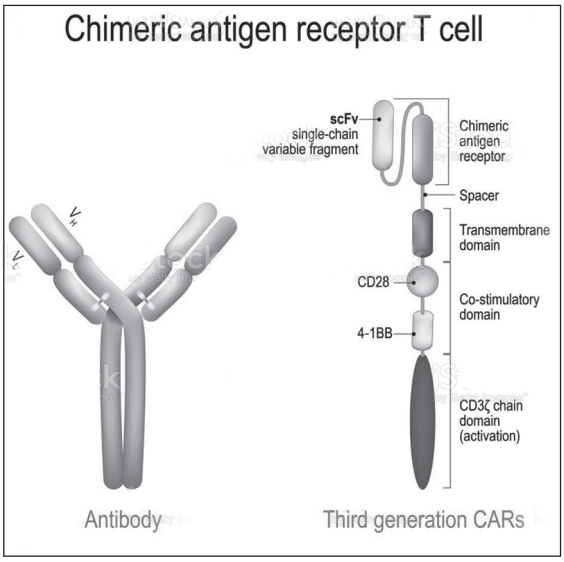

এবার আমরা বুঝে নেব- ক্যান্সার কোশের কিছু বৈশিষ্ট্য। ক্যান্সার কোশের নিউক্লিয়াসটি স্বাভাবিক কোশের তুলনায় অনেকটাই বড় হয়। অনেক সময় ক্যান্সার কোষে একের বদলে একাধিক নিউক্লিয়াস দেখা দেয়। কোশের অঙ্গানু মাইটোকন্ড্রিয়া ফুলে যায় ও তার কৃষ্টি অসম ও অস্বাভাবিক হয়ে যায়। ক্যান্সার কোশে বহু সময় তারা বেশ কয়েকটি স্থানে দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে। ক্যান্সার কোশের ক্রোমোজোমগত পার্থক্য হয়ে যায়—স্বাভাবিক কোশ ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট। কিন্তু ক্যান্সার কোশে বহু ক্ষেত্রে অ্যানিউপ্লয়ডি(Aneuploidy) দেখা যায়। অর্থাৎ একটি ক্রোমোজোম সংখ্যা বেড়ে বা কমে যায় ফলে ক্রোমোজোম সংখ্যা (2n+1), (2n-1) ইত্যাদি হয়।

ক্রনিক মায়োলোজেনাস লিউকেমিয়া নামক ক্যান্সারে ক্রোমোজোম ৯ এবং ক্রোমোজোম ২২ মধ্যে পারস্পরিক ট্রান্সলোকেশন বা খন্ড বিনিময়ের ফলে ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia) নামক অস্বাভাবিক ক্রোমোজোম উৎপন্ন হয়।

কি করে ক্যান্সার সেলকে ধ্বংস করে—

টি-সেলের রিসেপটার আছে। রিসেপটার হল একটা সেল বা কোশ যেটা আলো, তাপ, বা অন্যান্য উদ্দীপকের বস্তুর প্রতিক্রিয়া পাঠাতে পারে। ফলে তারা রাসায়নিকের মাত্রাটা দেখতে পারে। কার্ডিফের এই গবেষক দলটি রক্তের এই টি-সেল এবং তার রিসেপটার আবিষ্কার করেছে। যা দিয়ে পরীক্ষাগারে বড় পরিসরে ক্যান্সারের কোশ আবিষ্কার করে এবং ধ্বংস করতে পারে। এইসব ক্যান্সারের মধ্যে রয়েছে ফুসফুস, ত্বক, রক্ত, কোলন, স্তন, হাড়, প্রোস্টেট, ওভারি, কিডনি, এবং জরায়ুর ক্যান্সার।

টি-সেল : পরিচয় নেয়া দরকার। এটি এক ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা। এই কোশটি ইমিউন সিস্টেমের অংশ। এটি অস্থিমজ্জার স্টেমকোশ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এবং ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। এই কোশটিকে টি লিম্ফোসাইট এবং থাইমোসাইট ও বলা হয়।

সাইটোটক্সিক টি-কোশ : CTL গুলি টিউমার কোশ এবং আন্তঃকোশীয় কোশগুলির বিরুদ্ধে সাইটোটক্সিক এই কোশ গুলি ১. CD-8 কোরিসেপ্টরকে প্রকাশ করে। ২) সংক্রামিত কোশগুলিকে একটি অ্যান্টিজেন-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ধ্বংস করে যা APC-তে MHC ক্লাস। CTL সরাসারি অ্যাপোপটোসিস প্ররোচিত করে লক্ষ কোশগুলিকে হত্যা করতে সক্ষম। অ্যাপোপটোটিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় নিউক্লিয়াস এবং অন্যান্য এনজাইম জিনোমকে ধ্বংস করতে সাহায্য করতে পারে। এইভাবে ভাইরাসের সমাবেশ এবং অন্যান্য কোশের সম্ভাব্য সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। (সূত্র- জেফ্রী কে, এলসেভিয়ারের এন্টিগ্রেটেড রিভিউ ইমুইনোলজি এন্ড মাইক্রোবায়োলজি দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২) CTL's শুধুমাত্র টার্গেট কোশে অ্যাপোপটোসিস প্ররোচিত করে; প্রতিবেশী টিস্যু কোশ প্রভাবিত হয় না।

ইমিউন সিস্টেমের গঠন— সাইটোটক্সিক টি কোশগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপসেট যা ম্যালিগন্যান্ট কোষের মত আন্তঃকোশীয় সংক্রমণে প্রতিক্রিয়া জানায়। এই কোশগুলির কোশের পৃষ্ঠে CD-8 অনু থাকে এবং সরাসরি সংক্রমিত কোশগুলিকে হত্যা করে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (সূত্র: ইনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইনফেকশন এন্ড ইমিউনিটি, ২০২২)

একটি অত্যাধুনিক থেরাপি : যেসব ক্যান্সার কোশগুলি নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে দ্রুত রোগ ছড়ায় ট্র্যাডিশনাল কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট সে সব কোশগুলিকে নষ্ট করে এই রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এই এজেন্টরা ক্যান্সার কোশগুলি ছাড়াও দেহের অন্যান্য কোশ যারা নাকি নিজেরা দ্রুত বিভক্ত হয় তাদেরও ক্ষতি করে। যেমন বোনম্যারো, ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক ও হেয়ার ফলিকলে যে কোশগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। এই কারণেই কেমোথেরাপীর কয়েকটি সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হল— মায়েলোসাপ্রেশন (রক্তকণিকার উৎপাদন হ্রাস পাওয়া, সে কারণে ইমিউনোসাপ্রেশন হয়) মিউকোসাইটিক, অ্যালোপেশিয়া (চুল পড়ে যাওয়া)

কিছু নতুন অ্যান্টি-ক্যান্সার ড্রাগ (যেমন— মনোক্লোনাল এন্টিবডিস) ক্যান্সার কোশগুলিতে থাকা প্রোটিন গুলির ক্ষতি করে। এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে অনেক সময় টার্গেটেড থেরাপিও বলা হয়। প্রায়ই এই গতানুগতিক কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট এর সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। (অ্যান্টিনিও প্লাস্টিক ট্রিটমেন্ট রেজিমেন)। এই চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যয়বহুল হলেও একেবারে মলিকিউলার পর্যায়ে গিয়েছে। কেমোথেরাপির মাধ্যমে কিছু কিছু ক্যান্সার যেমন— লিম্ফোমাস, করিওকারসিনোমা, এবং জার্ম টিউমার সারিয়ে ফেলা যায়। (তথ্য ডাঃ রাকেশ রায় মেডিকেল অঙ্কোলজি বিভাগ, সরোজ গুপ্ত ক্যান্সার সেন্টার এন্ড রিসার্চ।)

সংবাদ

সুরধনী নদী বাঁচাও পদযাত্রা

মনে পড়ে হেলা বটতলা।
মনে পড়ে মহিষের স্নান।
জল ছিল সুরধুনী খাতে
জাল ছিল, ছিল সারিগান।
গাছও নেই নদী নেই জল,
লাভে লোভে ভরাট খাদান,
প্রেমে আর নদে ভাসে কই,
বান এলে কেড়ে খায় জান।
হে নদী ছবির মতো বও,
ফেরাও তীরের চেনা বট,
গহন গহীন ডুব জলে,
আবার ভাসিয়ে দেবো ঘট।

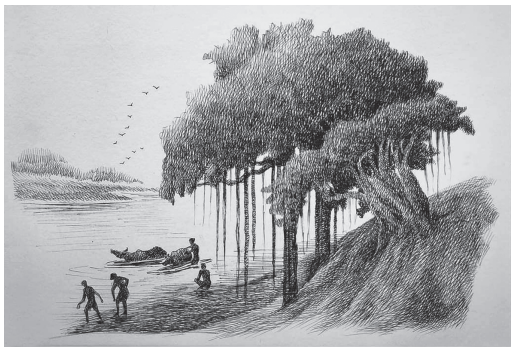

রেখা : সুমিত দাস, লেখা : সুব্রত বিশ্বাস

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ : শান্তিপুরের সুরধনী নদী বাঁচানোর দাবিতে পদযাত্রা

২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালন

সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল

কোচবিহার গোপালপুর হাইস্কুল

জলপাইগুড়ি সায়েন্স এ্যান্ড নেচার ক্লাব

পিপলস্ এ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স এ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট

বারুইপুর গার্লস হাইস্কুল

বিজ্ঞান ভাবনা বহরমপুর

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

কত জনপদ হারিয়ে গেলে, মানবে তুমি শেষে

চারিদিকে গেলো গেলো রব উঠেছে। তলিয়ে যেতে বসেছে জোশীমঠ। হিমবাহ ভেঙে তুষারধ্বস নেমেছে উত্তরাখণ্ডের চমোলি জেলায়। ৮ ডিসেম্বর সকালে এই তুষারধ্বসের জেরে ধৌলিগঙ্গার জলস্তর প্রবল ভাবে বেড়ে যায়। তীব্র জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় একের পর এক গ্রাম। ভেঙে যায় সেতু। ইতিমধ্যেই সরকারি হিসেবে মারা গেছেন ১০ জন শ্রমিক। নিখোঁজ আরো প্রায় ১৫০ জন। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন তপোবন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিক। প্রশাসনিক স্তরে আশঙ্কা করা হচ্ছে এদের কেউই হয়তো আর বেঁচে নেই। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যসচিব ওম প্রকাশ জানিয়েছেন, আটকে পড়া জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অনেকেই হয়তো জলের তোড়ে ভেসে গেছেন। ব্যস্ত প্রশাসন। কিন্তু এদিকে উত্তরাখণ্ড সরকার জোশীমঠের বিপর্যয় সামাল দেওয়ার আগেই প্রকাশ্যে এল উত্তরাখণ্ডের আরও কিছু অঞ্চলে ফাটলের খবর। উত্তরাখণ্ডের তেহরি জেলার চাম্বা, কর্ণপ্রয়াগ, নৈনিতাল-সহ উত্তরাখণ্ডের বহু বাড়ি, রাস্তায় বড় বড় ফাটলের সন্ধান পাওয়া গেছে। ক্রমাগত ভূমিধ্বসের ফলে এই এলাকাগুলির অবস্থাও জোশীমঠের মতোই হবে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কগ্রস্ত উত্তরাখণ্ডের মানুষ। তবে সাধারণ মানুষের আতঙ্ক কিংবা বিশেষজ্ঞদের মতামত কোনদিনই দমিত করতে পারেনি কিছু মানুষের সর্বগ্রাসী লোভকে, টলাতে পারেনি প্রশাসনিক ঔদাসীন্যকে। যদি পারতো তাহলে আমরা ভুলে যেতে পারতাম না ২০১৩-র সেই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা।

২০১৩-র জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে চারদিনের তুমুল বর্ষণের ফলে উত্তরাখন্ড, হিমাচল প্রদেশ এবং পশ্চিম নেপালের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হওয়া হড়পা বান এবং ভয়ংকর ধ্বসে কেদারনাথের মন্দির সহ বিশাল অঞ্চল প্রায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। মারা যান পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ। পর্যটন ব্যবসার ক্ষতিকে যোগ করলে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪১৪৪ হাজার কোটি টাকা। সেদিনও প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছিলো, আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিলেন মানুষ, মতামত জানিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু আমরা শিক্ষা নিই নি।

আজ থেকে একশো বছরেরও আগে যে কথা বুঝেছিলেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যে সাবধান বাণী তিনি উচ্চারণ করেছিলেন বারবার তাতে কর্ণপাত করার প্রয়োজনবোধ করিনি আমরা কেউ, প্রয়োজনবোধ করেননি প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরাও। তিনি বুঝেছিলেন, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভ এবং প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের অদম্য প্রচেষ্টার ফলেই বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলি ভেঙে গেছে তাসের ঘরের মতো। তিনি বলেছিলেন, 'বনজ সম্পদকে মানুষের অতিরিক্ত লোভের কবল থেকে বাঁচানো একটি বৈশ্বিক সমস্যা।' কেবলমাত্র এই সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়েই সম্ভব মানবজাতির সমূহ বিনাশকে ঠেকানো।

আমাদের দেশের সিন্ধু সভ্যতার পতনের জন্যও কিন্তু বেশিরভাগ ঐতিহাসিক সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগকেই দায়ী করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে ক্রমাগত বন্যা ও বারংবার ভূমিকম্প, সিন্ধু নদীর গতিপথ পরিবর্তন, অনাবৃষ্টি এবং ঘাগ্গর নদীর শুকিয়ে যাওয়া এই সভ্যতার পতনের মূল কারণ।

উত্তরাখণ্ডের যেখানে সেখানে গজিয়ে ওঠা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, অবাধে বনভূমি ধ্বংস, পাহাড় ও গাছপালা কেটে বড় বড় রাস্তা তৈরি, যত্রতত্র হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও বাড়ি তৈরী, অলকানন্দার দুপারে নুড়ি পাথর ও মাটি তুলে নেওয়া, নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করে নদীর পার বরাবর রাস্তা নির্মাণ, ইত্যাদির ফল আজকের এই ভয়াবহ ঘটনা। এই অপরিকল্পিত, অবৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ও নগরায়ন এবং প্রকৃতির নিয়মকে তোয়াক্কা না করার ফলেই দেবভূমি আজ এই বিপদের মুখোমুখি।

আমাদের রাজ্যের দিকে নজর ফেরালে বোঝা যাবে আমরাও কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি এক ভয়ংকর খাদের প্রান্তে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল অর্থাৎ দার্জিলিং, কার্সিয়ং, কালিম্পং প্রভৃতি এলাকায় যে গতিতে চলেছে যত্রতত্র হোটেল নির্মাণের কাজ, চলছে পাহাড় এবং গাছ কাটার মতো পরিবেশ অপরাধ, তাতে অচিরেই হিমালয়ের বরফ গলে

বঙ্গোপসাগর ও আরবসাগরের জলস্তর বাড়িয়ে দেবে বেশ কয়েক ফুট। এর ফলে সুন্দরবনসহ দুই ২৪ পরগনা, কলকাতা মেদিনীপুর এবং হাওড়ার এক বিশাল অংশ সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হবে বলে মনে করছেন বৈজ্ঞানিকরা। এইভাবে একের পর এক জনপদ হারিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে আর এদিকে পরিবেশ শরণার্থীদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

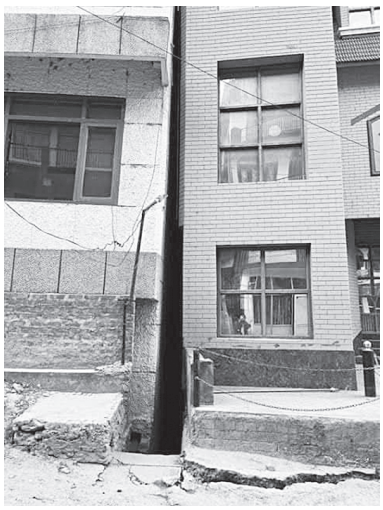

আমরা কি করবো? কি রেখে যাবো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য? নিশ্চিত মৃত্যুর ঠিকানা? গুটিকয়েক মানুষের অপরিসীম লোভ এবং তার সাথে প্রশাসনের অমার্জনীয় নির্লিপ্ততার হাতে আমাদের এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিদের ভাগ্য বন্ধক রেখে হাতপা গুটিয়ে বসে থাকবো? নাকি প্রশাসনকে বাধ্য করবো উন্নয়নের অজুহাতে, কেবল-মাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থের কারণে যেন কোনমতেই কোনখানেই কোনরকম অবৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে।

শেষে আবারও স্মরণ করি সেই রবীন্দ্রনাথকে। তিনি বলেছিলেন, ‘প্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তার পরে আসে বিনাশের পালা’। আমরা বহুপূর্বেই পার করে এসেছি সেই সীমা। এখন শুরু হয়ে গেছে প্রকৃতির প্রতিশোধ নেয়ার পালা, শুরু হয়ে গেছে আমাদের বিনাশের পালা। দেরি করার মতো এক মুহূর্ত সময় আমাদের হাতে আর নেই। পরিবেশ বিজ্ঞানী এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের কথাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত গোটা এলাকা জুড়ে উন্নয়ন ও নগরায়নের নামে অহরহ সংঘটিত হয়ে চলেছে যে পরিবেশ অপরাধ তা বন্ধ করতে হবে যে কোন মূল্যে। অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে পাহাড় এবং গাছ কেটে কিংবা জলধারার গতিপথ রুদ্ধ করে বড় বড় বিলাসবহুল হোটেল, রেস্টুরেন্ট নির্মাণের মতো অপরিণামদর্শী

কর্মকান্ড। সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে প্লাস্টিকের ব্যবহার। এর সাথে আশু প্রয়োজন এই সকল পার্বত্য এলাকার আদি অবস্থার যথাসম্ভব পুনঃপ্রতিষ্ঠা। নতুন করে বৃক্ষরোপণ জাতীয় কর্মোদ্যোগ নিতে হবে। এই কাজের দায়িত্বে থাকবেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সহ এলাকার সাধারণ মানুষ ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পর্ষদগুলি। নাহলে আমাদের রাজ্য সহ সমগ্র দেশেই একের পর এক জোশীমঠ তৈরি হবে এবং ইতিমধ্যেই শরণার্থী সমস্যা নিয়ে জর্জরিত আমাদের দেশ আরো একটি ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হবে—পরিবেশ উদ্বাস্তুদের সমস্যা।

লেখক আইনজীবী, পরিবেশকর্মী ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক
email: biswajit.envlaw@yahoo.co.in • *M. 8420762517*

সংবাদ

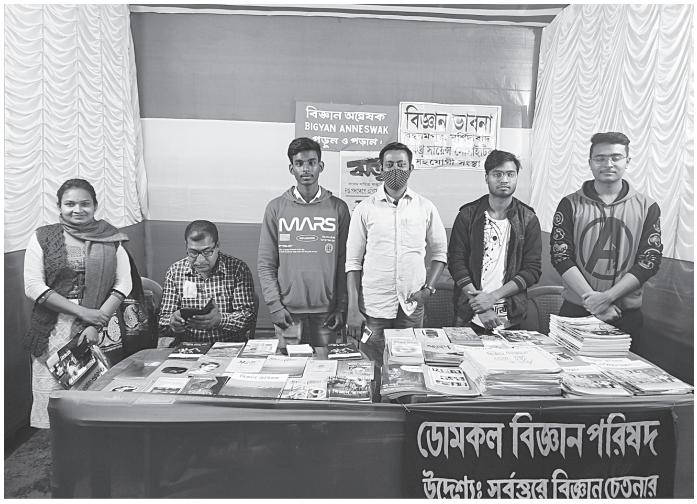

মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল বইমেলায় বিজ্ঞান অন্বেষক, বিজ্ঞান ভাবনা ও এবং কি, কে ও কেন? পত্রিকার স্টল

বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনার নতুন বই

আমরা সবাই তারার অংশ

সংগ্রহ করুন

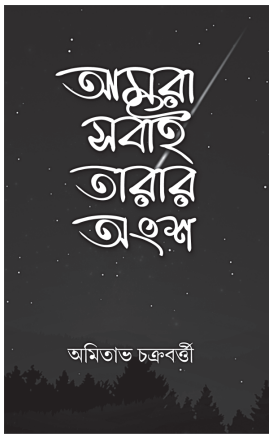

সৌম্যকান্তি জানা

পাখি চিনতে ছ' বছর!

২০১১ সাল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিক। শীত চলে গেলেও তার রেশ পুরোপুরি কাটেনি। সেদিন যথাসময়ে স্কুলে পৌঁছে হাজিরা খাতায় সই করে নিজের জায়গায় এসে বসেছি। এমন সময় একটা পাখির ডাক শুনলাম — চ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-চু। নানারকম পাখির ডাক স্কুলে থাকাকালীন সবসময়ই শুনি, কারণ আমার স্কুলের তিন দিকে অনেক বড়ো বড়ো গাছ আছে — আকাশমণি, ঝাউ, শিরীষ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, জারুল, মেহগিনি, বাবলা, নারকেল আর গেঁওয়া। আর স্কুলের সামনে মাঠের মধ্যে রয়েছে দুটো ছাতিম, একটা পলাশ, একটা কদম, একটা শিমূল, পাঁচটা পাম আর একটা বটলব্রাশ গাছ। সারাদিন নানারকম পাখি ঐ সব গাছে ঘুরে ঘুরে পোকা আর ফুলের মধু খায়। বেশ কিছু গাছে পাখির বাসাও আছে। শব্দটা মনে হল যেন সামনের বটলব্রাশ গাছ থেকেই এল। শব্দের তীব্রতা খুবই বেশি আর শব্দটা আমার কানে পুরো অচেনা ঠেকল। এমন ডাক তো আগে শুনেছি বলে মনে করতে পারছি না। প্রেয়ার শুরু হতে তখনও কয়েক মিনিট

মৌটুসি

টুনটুনি

বাকি। বেরিয়ে এলাম দোতলার বারান্দায় বটলব্রাশ গাছের ঠিক সামনে। তখন কয়েকটা মৌটুসি আর দুর্গা টুনটুনি বটলব্রাশের ফুল থেকে মধু খাচ্ছিল। একটা কাঠবিড়ালিও নজরে পড়ল। কিন্তু আর কোনও পাখি নজরে এল না।

ইতোমধ্যে প্রেয়ারের ঘন্টা পড়ে যাওয়ায় একতলায় নেমে প্রেয়ারের লাইনে দাঁড়ালাম। এমন সময় আবার সেই শব্দ—চ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-চু। এবার যেন মনে হল পূর্ব দিকের আকাশমণি গাছ থেকেই শব্দটা ভেসে

কাঠবেড়ালি

এল। আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। প্রেয়ার শেষ হওয়ার সাথে সাথে পা চালিয়ে চলে এলাম স্কুলের পেছন দিকে আকাশমণি গাছগুলোর দিকে। পাঁচটা বেশ বড়ো বড়ো গাছ। সব গাছই ঘন পাতায় ঢাকা। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার সেই ডাক। শব্দের উৎসটা এবার খুব ভালো করে বুঝতে পারলাম। সামনের আকাশমণি গাছটার আগার দিকে তাকাতেই নজরে এল হাঁড়িচাচা পাখির মতো সাইজের একটা পাখি। ডালের উপর হেঁটে হেঁটে সম্ভবতঃ পোকা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। পাখিটার চঞ্চু আর পায়ের রঙ ফ্যাকাশে সাদা। চোখের চারপাশে গোলাকার সাদা বর্ডার। মাথাটা কালচে, পিঠ গাঢ় খয়েরি, ডানা আর লেজের রঙ বনকাকের মতো কালচে-লাল। পায়ুর চারপাশ ও লেজের তলার দিকের রঙ ইঁটের মতো লাল। বুক ও পেটে সাদা-কালো ছিট। এমন পাখি আমি কোনওদিন দেখিনি। আমি পাখিটাকে ভালোভাবে দেখছি, এমন সময় সে মাথাটাকে বাঁদিকে বেঁকিয়ে কী যেন দেখল, আর আবার ডেকে উঠল চ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ। এবারের ডাকে শেষে 'চু' নেই! আমাকে দেখে নাকি? ক্লাস শুরুর ঘন্টা পড়ে যেতে ফিরে এলাম স্টাফ রুমে।

সেদিন আরও অনেকবার পাখিটার ডাক শুনলাম। নজরেও এল বেশ কয়েকবার। আকাশমণি আর বটলব্রাশ গাছেই ওর ঘোরাফেরা। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে পাখিটাকে চেনার জন্য বরাবরের মতো শরণাপন্ন হলাম সালিম আলি আর অজয় হোমের। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজে ওই পাখিটার কোনও হদিস করতে পারলাম না ওঁদের লেখা বইতে। শেষ অস্ত্র আন্তর্জাল। কিন্তু কীভাবে খুঁজব ভেবে পাচ্ছিলাম না। শেষে 'Birds of Bengal' লিখে খুঁজতে লাগলাম। আন্তর্জাল অসংখ্য পাখির ছবি হাজির করতে থাকলেও ওই পাখিটার ছবি দেখাতে পারল না। তখনকার মতো হাল ছেড়ে দিলাম। পরের দিন আমার ডিজিট্যাল ক্যামেরাটা ব্যাগে পুরে স্কুলে গেলাম। পাখিটার দেখাও পেয়ে গেলাম। ডিজিট্যাল ক্যামেরায় যতটা ভালো করে তোলা যায় ততটা ভালো করে পাখিটার ছবি তুললাম নানা কোণ থেকে। রাতে সেই ছবি পোস্ট করে দিলাম ফেসবুকে — যদি কোনও বন্ধু পাখিটাকে শনাক্ত করতে পারে! ২০১১ সালে ফেসবুক এখনকার মতো এতটা জনপ্রিয় হয়নি, কারণ অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল তখনও মানুষের হাতে আসেনি। আর তাই ফেসবুকে আমার বন্ধুর সংখ্যাও ছিল বেশ কম। সেই বন্ধুরা ব্যর্থ হল পাখিটাকে শনাক্ত করতে।

ইতোমধ্যে কেটে গেছে ছ'বছর। আমার স্মৃতি থেকে ওই পাখিটার কথা যেমন ক্রমশঃ ফিকে হয়েছে তেমনই ফেসবুকে আমার বন্ধুর সংখ্যা অনেক বেড়েছে, যাঁদের মধ্যে আমার একদা ঘনিষ্ঠ অগ্রজ ও অনুজ অনেক বন্ধু রয়েছে। ওঁদের মধ্যে অনেকেই পক্ষিপ্রেমী। কেউ কেউ পক্ষিবিশেষজ্ঞ। হঠাৎ একদিন ফেসবুক খুলে দেখি ফেসবুক আমাকে ছ'বছর আগেকার একটা পোস্ট স্মৃতি হিসেবে দেখাচ্ছে, আর সেই পোস্ট হল ওই নাম না জানা পাখিটাকে নিয়ে। আমি ওই পোস্টটিকে পুনরায় আমার টাইমলাইনে শেয়ার করলাম। এবার আর আমাকে হতাশ করেনি আমার বন্ধুরা।

দুজন বন্ধু আমাকে জানাল যে এটা Maroon Oriole, যা কেবল উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় কিছু পাওয়া যায়।

মেরুন ওরিয়ল-১

তবে পাখিটা মুলতঃ মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, বাংলাদেশের পূর্বাংশ, নেপাল, ভূটান, তিব্বত ও তাইওয়ানে দেখা যায়। একজন বন্ধু বিপুল বিস্ময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে এ পাখির ছবি আমি কোথায় তুললাম। পাখিটার গল্প বলার পর সেই বন্ধু আমাকে সোৎসাহে বলেছিল, "এ তো এক আশ্চর্য আবিষ্কার দাদা!!! সুন্দরবন অঞ্চলে এ পাখি কখনও দেখা গেছে বলে নজির নেই, অথচ তুমি দেখেছো। এ তো অভাবনীয় তথ্য পক্ষী গবেষকদের কাছে!" আমি

মেরুন ওরিয়ল-২

সাথে সাথে গুগলের শরণাপন্ন হলাম। না, বন্ধুদ্বয় ভুল বলেনি। পাখিটা নিশ্চিতভাবেই Maroon Oriole। শুধু ছবি বা বিবরণ নয়, ওর ডাকও মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব হল। হুবহু এক। নিজের অজান্তেই আমি এক অভাবনীয় 'আবিষ্কার' করে ফেললাম কি?

এই মেরুন ওরিওল হল আমাদের খুব চেনা বেনে-বউ 'Oriolus xanthornus' পাখির জাতভাই। আকারে বেনে-বউ এর চেয়ে কিছুটা বড়ো। আর বেনে-বউয়ের রঙ টকটকে হলুদ হলেও মেরুন ওরিওলের লেজ ও পিঠের দিকের রঙ অনেকটা মেরুন বা লালচে-খয়েরি। তাই একে বাংলায় তামারঙা বেনে-বউ বললে মোটেই বেমানান লাগবে না। আমি যে পাখিটিকে দেখেছি তার রঙ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মেরুন ওরিওলের চেয়ে অনেকটাই হালকা। ওইসব অঞ্চলের মেরুন ওরিওলের মাথা ও ডানা কুচকুচে কালো, আর পিঠ ও লেজের রঙ গাঢ় মেরুন।। উভয়েই একই গোত্রের (Oriolidae) অন্তর্ভুক্ত পাখি। বিজ্ঞানসম্মত নাম Oriolus trillii। ভারতে পাওয়া যায় হিমালয়সংলগ্ন অরণ্যে। হিমাচল প্রদেশ থেকে অরুণাচল প্রদেশ এবং মণিপুরের পার্বত্য এলাকার অরণ্য এদের আবাসস্থল। তবে ভারত ছাড়াও নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, মায়ানমার, তিব্বত, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, চিন, তাইওয়ান, লাওস ও থাইল্যান্ডে মেরুন ওরিওল পাওয়া যায়।

পুরুষ ও স্ত্রী মেরুন ওরিওলের চেহারা দেখে পার্থক্য করা যায়। স্ত্রী মেরুন ওরিওলের পালকের রঙ অপেক্ষাকৃত গাঢ়, আর বুকের কাছে গাঢ় কালো রঙের ছিট-ছিট দাগ দেখা যায়। অবশ্য বাচ্চা মেরুন ওরিওলের পালকের রঙ অনেক হালকা হয়, আর পেটে বাদামি রঙের লম্বা ডোরা দাগ থাকে। আমি যে পাখিটিকে দেখেছি তা স্ত্রী পাখি বলেই মনে হয়। স্ত্রী ও পুরুষ প্রজননের সময় ছাড়া সচরাচর একসাথে থাকে না। প্রজনন ঋতুতে স্ত্রী ও পুরুষ মেরুন ওরিওল একসাথে বাসা বানায়। গাছের ডাল থেকে পেয়ালা আকৃতির বাসা ঝুলে থাকে। গাছের তন্তু দিয়ে বাসা তৈরি হয়। তন্তুগুলো মাকড়সার জাল দিয়ে জুড়ে জুড়ে তৈরি করে বাসা। বাবা ও মা উভয়ে মিলে বাচ্চার পরিচর্যার দায়িত্ব সামলায়। মেরুন ওরিওলদের প্রিয় খাবার হল ডুমুর, বেরি জাতীয় ফল, পোকামাকড় আর ফুলের মধু। আমার নজরে অবশ্য পোকা খেতেই দেখেছি।

বেনেবৌ

মেরুন ওরিওল বা তামারঙা বেনে-বউদের সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি কোনও খবর জোগাড় করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেই ২০১১ সালে মাস তিনেকের জন্য ওকে দেখেছিলাম। এপ্রিল মাস পর্যন্ত ও আমার স্কুলের গাছপালায় ঘুরে বেড়িয়েছে আর থেকে থেকে তারস্বরে চ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-চু চ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-চু করে চীৎকার করেছে। কী বলতে চেয়েছিল সে? সে কি কোনও প্রেম-প্রত্যাশী পুরুষ সঙ্গীকে ডাকছিল? নাকি সে এক পথহারা পাখি হয়ে কেঁদে ফিরছিল একা একা? এপ্রিল মাসের পর পাখিটা আর একবারও এলাকায় দেখা দেয়নি। আর কোথাও ওর কোনও ডাকও শুনিনি। আজ পর্যন্ত ওটাই আমার প্রথম ও শেষ দেখা মেরুন ওরিওল বা তামারঙা বেনে-বউ।

লেখক শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

*email:*janasoumyakanti@gmail.com • *M. 9064202882*

ড. শুভাশিস পাল

বন্ধু সরীসৃপ : শাঁখামুটি ও গোসাপ

শাঁখামুটি

গোসাপ

প্রায় সব মানুষেরই সাপ সম্পর্কে একটা ভয় মিশ্রিত কৌতূহল আছে। সাপ মেরুদন্ডী শ্রেণির প্রাণী। সারা দেহ শুকনো বহিঃত্বকীয় আঁশে ঢাকা। সাপকে অকারণে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। মানুষ সাপের খাবার নয়, তাই সাপ আক্রান্ত না হলে আগবাড়িয়ে কামড়াতে আসে না। সাপে কামড়ানোর দুর্ঘটনা যেগুলি ঘটে তার বেশিরভাগেরই কারণ অসাবধানতাবশতঃ সাপের গায়ে হাত-পা দিয়ে ফেলা, মশারি টাঙিয়ে না শোওয়া এবং সাপে কামড়ানোর পর অতিরিক্ত ভয় পেয়ে যাওয়া ও দেরিতে হাসপাতালে পৌঁছনো। ওঝা-ঝাড়ফুঁক সাপ কাটার কোন চিকিৎসা নয়। প্রকৃত কার্যকরী চিকিৎসা হচ্ছে "সূত্র ১০০", সাপে কামড়ানোর ১০০ মিনিটের মধ্যে যদি রুগীকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ১০০ মিলিলিটার ASVS (Anti Snake Venom Serum) দেওয়া হয় তাহলে রুগীর প্রায় ১০০ শতাংশ সুস্থ হয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে। সাপের সম্মুখীন হলে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সাপটিকে চলে যেতে দেওয়াই ভাল অথবা সাপটিকে ধরার জন্য নিকটবর্তী বনবিভাগে ফোন করা যেতে পারে।

ভারতে মোট ২৯৭ প্রজাতির সাপ দেখা যায়। যার মধ্যে ৫২টি প্রজাতি বিষধর। পশ্চিমবঙ্গে দেখা মেলে ১১২ প্রজাতির। এদের মধ্যে প্রথম চারটি বিষধর হল গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া ও কালাচ বা ডোমনা চিতি। প্রতি বছর সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৫৮০০০। এর মধ্যে চন্দ্রবোড়ার কামড়েই মারা যান প্রায় ২৫৩০০ জন। পশ্চিমবঙ্গে সাপের কামড়ে বছরে মারা যান প্রায় ৩৫০০ জন, যার মধ্যে ৮০ শতাংশ মৃত্যুর কারণ চন্দ্রবোড়া। এরপরে আছে কালাচের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা। অথচ সব ধরনের বিষধর সাপের বাড়বাড়ন্ত নিয়ন্ত্রণে রাখতে এদেরকে শিকার করে খায় এমন সরীসৃপও প্রকৃতিতে আছে। এরকমই দুটি সরীসৃপের একটি হল এক প্রজাতির চিতি সাপ, যার নাম শাঁখামুটি (Banded krait), অপরটি হল গোসাপ (Varanus lizard)। প্রকৃতি নিজেই সাপের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা রেখেছে। শাঁখামুটি ও গোসাপের প্রধান খাবার হল অন্যান্য সাপ ও সাপের ডিম। এই খাদ্য-খাদক শৃঙ্খলের ভারসাম্যই বিঘ্নিত হয়েছে শাঁখামুটি ও গোসাপের বিপন্নতার কারণে।

বিজ্ঞানীরা শাঁখামুটির নাম দিয়েছেন Bungarus fasciatus. এদের বিচরণ গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে। এরা প্রধানত জলার ধারে আস্তানা গাড়ে। তবে ইঁদুরের গর্তে, উইঢিবিতেও থাকে। বিষধর কিন্তু অতি শান্ত ও লাজুক সাপ। কামড়ানোর ঘটনা বিশেষ শোনাই যায়নি। এমনও জানা গেছে দিনের বেলায় এই সাপ নিয়ে বাচ্চারা খেলা করছে। বিরক্ত করলেও তেড়ে আসে না। দেহ পাঁচ-সাত ফুট লম্বা হতে পারে। লেজ ভোঁতা। সেজন্য দুমুখো সাপ বলে ভুল হয়। তেকোনা দেহ জুড়ে পরপর সাজানো থাকে বাহারি কালো-হলুদ পটি বা ব্যান্ড। পটিগুলো দেড়-দু ইঞ্চি চওড়া। এই সাপটি মানুষের বন্ধু। ইঁদুর, ব্যাঙ, গিরগিটি এদের খাদ্যতালিকায় থাকলেও এরা অন্যান্য সাপ খেতেই বেশি পছন্দ করে। চন্দ্রবোড়া, কালাচ ইত্যাদি বিষধর সাপের বাচ্চা খেয়ে মানুষকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে। যেখানে শাঁখামুটি থাকে তার আশেপাশে বিষধর সাপ সংখ্যায় বাড়তে পারে না।

একই রকম উপকার করে গোসাপ। পৃথিবীতে প্রায় ৮০ প্রজাতির গোসাপ আছে। তার মধ্যে চারটির বাসভূমি ভারত। পশ্চিমবঙ্গে যে প্রজাতিটিকে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সেটির বিজ্ঞানসম্মত নাম *Varanus benghalensis.* এদের মজবুত চারটি পা তীক্ষ্ণ নখযুক্ত। ঘাড় লম্বা। লেজ খুব শক্তিশালী। আক্রান্ত হলে চাবুকের মত লেজের ঝাপট মারে। তবে লেজে কোন বিষ নেই। মাঠেঘাটে, জলার ধারে ঘুরে বেড়ায়। গাছে উঠেও শিকার করে। এরা নির্বিষ। মানুষের কোন ক্ষতিতো করেই না বরং উপকার করে। মাংসাশী এই সরীসৃপটি

একদিকে যেমন পোকামাকড় খেয়ে চাষের উপকার করে তেমনি খেতখামারে কাজ করা কৃষকদেরও বিষধর সাপের হাত থেকে বাঁচায়, কারণ এরা সাপের ডিম ও সাপ খেয়ে বিষধর সাপের সংখ্যা কমিয়ে দেয়।

চন্দ্রবোড়ার জন্মহার এমনিতেই বেশি। একটি চন্দ্রবোড়া বর্ষাকালে ৫০-৬০টা বাচ্চা দেয়। কালাচ একেবারে ১০-১২টা ডিম পাড়ে। গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষ যারা তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় নিয়মিত সাপের মুখোমুখি হয় তাঁদের কাছ থেকে জানা যাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের মাঠেঘাটে বিষধর সাপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে চন্দ্রবোড়া। সুন্দরবন এলাকায় বেড়েছে কালাচের প্রাদুর্ভাব। সঙ্গে গোখরো, কেউটেতো আছেই। বিষধর সাপের সংখ্যা বাড়বে তখনই যখন এদের ডিম ও বাচ্চা খেয়ে ফেলার মতো প্রাকৃতিক শিকারি থাকবে না। শাঁখামুটি ও গোসাপ বিষধর সাপের স্বাভাবিক শত্রু। তাই এই দুটি সরীসৃপের সংখ্যা কমলে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেই অন্যান্য বিষধর সাপের সংখ্যা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে থাকবে। ফলত বাড়বে মানুষের জীবনহানির ঘটনা। এইসব আসলে খাদ্য-খাদক শৃঙ্খল নষ্টের বিষময় ফল।

আগে বাংলার সব জায়গার মাঠেঘাটে ও জলার ধারে শাঁখামুটি ও গোসাপের ভালই দেখা মিলত। আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগে খাবার জন্য শত শত গোসাপ মেরে কাঁধের লাঠিতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে দেখা যেত। রঙিন চামড়া সংগ্রহের জন্য মেরে ফেলা হয়েছে অসংখ্য শাঁখামুটি। এইভাবে নির্বিচারে হত্যা, যথেচ্ছ কীটনাশক ও ফাঁসি জালের ব্যবহার এবং বসতিস্থান নষ্ট করার ফলে বর্তমান শাঁখামুটি ও গোসাপ দারুণ সংকটে। এই দুটি সরীসৃপই IUCN-এর লাল তালিকায় least concern (LC) শ্রেণিতে চলে এসেছে। ভারতীয় বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনে এদের কোনরূপ ক্ষতি করা আইন বিরুদ্ধ। প্রকৃতিতে বিষধর সাপও যেমন আছে তেমনি তাদের খাদকও আছে। শাঁখামুটি ও গোসাপের মত খাদক সরীসৃপগুলি আসলে বিষধর সাপের জৈব-নিয়ন্ত্রক। তাই এদের চেনা, জানা ও রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

লেখক শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: palsubhasis69@gmail.com • M. 9434423227

সংবাদ

সায়ন্তন যশ

আলোচনায় খুঁজেছি এগোনোর পথ

১৫ জানুয়ারি ২০২৩ বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার ২০ তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাগৃহে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। দিনের শুরুতে নাম নথিভুক্তকরণের পর আগত সকলে নিজেদের মধ্যে আলাপ পরিচয় করেন। পরিচয়পর্ব শেষ হওয়ার পর 'বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্যোক্তাদের বিশেষ ভাবনায় অভিজ্ঞ এবং প্রথিতযশা বিজ্ঞান লেখকদের পাশাপাশি নতুন বিজ্ঞান লেখকরাও পত্রিকাটি উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন পত্রিকার সম্পাদক প্রবীর বসু। এরপর বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকার প্রকাশক জয়দেব দে পত্রিকার আর্থিক অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন। এছাড়াও এই পর্বে বিজ্ঞান অন্বেষক ছাড়া আরও একটি পত্রিকা 'বিজ্ঞান ভাবনা'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান প্রচারক ডঃ মানস প্রতিম দাস।

২য় পর্বের অনুষ্ঠানটি ছিল একটি আলোচনা সভা। ভাবনায় ছিল: 'আলোচনায় খুঁজব এগোনোর পথ'। এই আলোচনা সভার সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক এবং আকাশবাণী কলকাতার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ মানসপ্রতিম দাস। আলোচক হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা সুমিত্রা চৌধুরী, অধ্যাপক সিদ্ধার্থ নারায়ণ জোয়ারদার, অধ্যাপক চন্দন সুরভী দাস, শ্রীঅনিন্দ্য দে, ডঃ অমিতাভ চক্রবর্তী এবং শ্রী রাজা প্রসাদ পাল। সঞ্চালকের অনুরোধে সমস্ত বক্তাই একেকটি বিশেষ পথ ধরে এগোনোর রাস্তা খোঁজা শুরু করেন। যেমন, সিদ্ধার্থ বাবুর বক্তব্যে ছিল বিজ্ঞান মনস্কতা তৈরির পথের হদিশ, সুমিত্রা দেবীর বক্তব্য ছিল বিজ্ঞান কর্মী ও বিজ্ঞান সংগঠনের দায়িত্ববোধ সম্পর্কিত। অন্যদিকে আবার চন্দন সুরভি বাবু বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিজ্ঞান প্রচারের বিষয়ে নানা সুবিধা অসুবিধার দিকটিতে আলোকপাত করেন। শ্রী অনিন্দ্য দে বললেন, গল্প বা শিল্পের রসবোধে মজে গিয়ে আমরা যেন বিজ্ঞান থেকে সরে না যাই; আবার অমিতাভ বাবুর বক্তব্য ছিল প্রকৃতিকে চেনা ও তার সংরক্ষণ নিয়ে। আর শ্রী রাজাপ্রসাদের বক্তব্য ছিল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞান প্রচারকে ঘিরে। মঞ্চে উপস্থিত আলোচকরা ছাড়াও দর্শক আসন থেকে উঠে এসে নিজেদের মত প্রকাশের মাধ্যমে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন আরও ১৭ জন বিজ্ঞান লেখক, বিজ্ঞান কর্মী কিংবা বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়ার শুভানুধ্যায়ী। এই পর্বে তিনজন দর্শকের থেকে প্রশ্ন নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এই পর্বের শেষে সঞ্চালকের দক্ষ সঞ্চালনায় কিছুটা হলেও এগোনোর পথ খুঁজে পাওয়া গেল এবং বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া সকলের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। পরিশেষে আগত সমস্ত আলোচক, গুণীজন এবং শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন বিজ্ঞান দরবার এর সভাপতি ড. গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলী মহাশয়। আলোচনা শেষে সুখাদ্যের পাশাপাশি এক মনোরম মতবিনিময়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, যা যে কোনো বিজ্ঞান লেখক বা বিজ্ঞান কর্মী বা বিজ্ঞান সংগঠনকে নিশ্চিতভাবেই এগোনোর পথ দেখায়।

লেখক গবেষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email:sayantan.jash98@gmail.com • M. 8515897026

অ নি ন্দ্য দে

ইনফ্রা-রেড থার্মোমিটার

সারা বিশ্ব জুড়ে যখন করোনার সন্ত্রাস চলছিল, সেই সময়ে মাস্ক, স্যানিটাইজার, সামাজিক দূরত্ব এই কথাগুলো যেমন আমাদের মুখে মুখে ফিরেছে, সেরকম থার্মাল স্ক্রিনিং শব্দবন্ধটাও আমাদের বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিল। টিভির পর্দায়, খবরের কাগজে প্রায়ই দেখা যাচ্ছিল একজন লোক হাতে একটা পিস্তলের মতো যন্ত্র নিয়ে সামনে দাঁড়ানো একজনের কপাল লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দিচ্ছেন। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির কপালে ফুটে উঠছে একটা লাল আলোর বিন্দু। আর সাথে সাথেই পিস্তলের ডিজিট্যাল পর্দায় ২৮, ২৯, ৩০, এরকম কিছু সংখ্যা ভেসে উঠছে। প্রশ্ন হল এখানে হচ্ছেটা কী? কিছুই না, ঐ ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা মাপা হচ্ছিল। অর্থাৎ, পিস্তলের মতো ঐ যন্ত্রটা আসলে একটা থার্মোমিটার, তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র। তবে, জ্বর হলে আমরা যেরকম থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মাপি, সেটা কাঁচনলের মধ্যে রাখা পারদ ভর্তি থার্মোমিটারই হোক বা ডিজিট্যাল থার্মোমিটারই হোক, থার্মাল স্ক্রিনিং-এর যন্ত্রটা কিন্তু মোটেও সেরকম নয়। জ্বর মাপতে হলে বাড়ির থার্মোমিটারগুলোকে গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে ধরতে হয়, আর কাঁচনলের পারদ গায়ের তাপমাত্রায় এলে তবে আমরা বুঝতে পারি জ্বর কত। থার্মাল স্ক্রিনিং-এর যন্ত্রটাকে কিন্তু গায়ের সঙ্গে লাগাতে হয় না। তাই এর আরেকটা নাম নন্-কনট্যাক্ট থার্মোমিটার। অনেক সময় আবার টেম্পারেচার গান বা লেজার থার্মোমিটার নামেও একে ডাকা হয়। যেহেতু তাপমাত্রা মাপতে হলে একে গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে ধরতে হচ্ছে না, তাই আজকাল এর ব্যবহারও হচ্ছে নানান জায়গায়। করোনার সময়েই যেমন হচ্ছিল। শারীরিক স্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে, আবার শরীরের তাপমাত্রাও মাপতে হবে। সুতরাং, নন্-কনট্যাক্ট থার্মোমিটারই একমাত্র ভরসা। অনেক সময় আবার খাবার-দাবারের তাপমাত্রাও মাপতে হয়। কিন্তু খাবারের মধ্যে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দেওয়াটা মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। আবার তাপমাত্রা খুব বেশি হলেও বস্তুকে হাতে ধরা বা তার গায়ে থার্মোমিটার ঠেকানো সম্ভব হয় না। সেসব ক্ষেত্রে এই নন্-কনট্যাক্ট থার্মোমিটারের সাহায্যই নিতে হয়।

যে নন্-কনট্যাক্ট থার্মোমিটার, মানে টেম্পারেচার গান এখন আমরা হরদম দেখছি, সেটা কাজ করে অবলোহিত রশ্মি অর্থাৎ ইনফ্রা-রেড রেডিয়েশনের সাহায্যে। দূরে বসে রিমোটের বোতাম টিপে আমরা যখন টিভির চ্যানেল পাল্টাই, তখন যে-রশ্মি রিমোট থেকে টিভিতে এই সংকেতটা পাঠায়, সেটাই অবলোহিত রশ্মি। আলো বা এক্স-রশ্মির মতো এটাও একটা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। তবে আলো বা এক্স-রশ্মির তুলনায় এর শক্তি অনেক কম। মজার ব্যাপার হল, কোনও বস্তুর তাপমাত্রা যদি মারাত্মক রকমের বেশি না হয়, সেক্ষেত্রে ঐ বস্তু যে তাপ বিকিরণ করে সেটাও আসলে অবলোহিত রশ্মি। এখন প্রশ্ন হল তাপমাত্রা মাপার জন্য কীভাবে আমরা একে কাজে লাগাতে পারি? এক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যার দুটো সূত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি যে, এই মহাবিশ্বে সবথেকে কম তাপমাত্রা যা হতে পারে, সেটা হল— ২৭৩° সেলসিয়াস, অর্থাৎ জল যে তাপমাত্রায় জমে বরফ হয় তার থেকেও ২৭৩° নীচে। পদার্থবিদ্যার সূত্র অনুসারে কোনও বস্তুর তাপমাত্রা এই -২৭৩° সেলসিয়াসের বেশি হলেই সে কিছু না কিছু অবলোহিত রশ্মি বিকিরণ করতে থাকবে। তার মানে আমাদের শরীর, বাড়ির টেবিল-চেয়ার, বাসনপত্র সবসময়েই অবলোহিত রশ্মি বিকিরণ করে যাচ্ছে। দ্বিতীয় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যে বস্তু যত বেশি গরম হবে, সে তত তীব্রভাবে অবলোহিত রশ্মি ছাড়তে থাকবে। এইখানে এসে আমরা বস্তুর তাপমাত্রা আর বস্তু থেকে যে বিকিরণ হচ্ছে তার তীব্রতার একটা সম্পর্ক পেয়ে যাচ্ছি। ঠিক এই ব্যাপারটাকেই ইনফ্রা-রেড থার্মোমিটারে কাজে লাগানো হয় প্রযুক্তির সাহায্যে।

এবার তাহলে এই নন্-কনট্যাক্ট ইনফ্রা-রেড থার্মোমিটারের ডিজাইনের দিকটায় আসা যাক। এই থার্মোমিটারের একেবারে সামনের দিকে থাকে একটা লেন্স। একটা আতস কাঁচকে চড়া রোদে ধরলে দেখবেন মাটিতে একটা গোল মতো জায়গা বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কাঁচটাকে একটু উপরে-নীচে ওঠালে নামালে ঐ উজ্জ্বল জায়গাটা একটু ছোট-বড় হতে থাকে। বিশেষ একটা জায়গায় কাঁচটাকে ধরতে পারলে উজ্জ্বল জায়গাটা একেবারে ছোট্ট একটা বিন্দুর মতো হয়ে যায়। বাচ্চা ছেলেরা ঐ উজ্জ্বল বিন্দুতে কাগজ রেখে অনেক সময় কাগজ-পোড়ানোর খেলা খেলে। তার মানে সূর্যের আলো, তাপ সব লেন্সের মধ্যে দিয়ে এসে এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে। আমাদের ইনফ্রা-রেড থার্মোমিটারে রাখা লেন্সের কাজটাও ঠিক সেরকম। মানুষের শরীর থেকে আসা অবলোহিত রশ্মি ঐ লেন্সের মধ্যে দিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় জড়ো হয়। এবারে ঐ রশ্মি এসে পড়ে একটা থার্মোপাইলে। দুটো আলাদা ধাতুর পাত একের পর এক রেখে এই থার্মোপাইল তৈরি করা হয়।

এর কাজ হল তাপশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে পালটে দেওয়া। ঐ তড়িৎশক্তিকে পাঠানো হয় একটা ডিটেক্টরে। ডিটেক্টর এবারে যে পরিমাণ তড়িৎশক্তি পাচ্ছে তা থেকে বস্তুর উষ্ণতাটাকে হিসেব করে ফেলে। আর সেটাই ফুটে ওঠে ডিজিট্যাল পর্দায়। এই হল ইনফ্রা-রেড থার্মোমিটারের কাজ। বুঝতেই পারছেন পুরো কাজটা হয় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। সুতরাং, পারদ থার্মোমিটারের থেকে যে এটা অনেক তাড়াতাড়ি জ্বর মাপতে পারবে সেটা নিশ্চিত। তবে একটা কথা বলে রাখি, এখানে যে লেজারটা ব্যবহার করা হয় তার কাজ হল শরীরের যে অংশ থেকে অবলোহিত রশ্মি নেওয়া হচ্ছে শুধু সেই অঞ্চলটুকুকে চিহ্নিত করা। এছাড়া তার আর কোনও কাজ নেই।

ইনফ্রা-রেড থার্মোমিটার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয়

আগে দেখে নেওয়া দরকার। যেমন অনেক সময়েই, যে বস্তুর তাপমাত্রা আমরা মাপতে চাইছি তার চারপাশের অন্য কোনও বস্তু থেকে অবলোহিত রশ্মি এসে থার্মোমিটারের পাঠ পালটে দেয়। আজকাল অবশ্য এই ভুলটাকে শোধরানোর জন্য পারিপার্শ্বিকের তাপমাত্রা সংশোধনের একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হচ্ছে অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার কারেকশন। এছাড়াও আমাদের দেখতে হবে শরীরের কতটুকু অংশ থেকে অবলোহিত রশ্মি নেওয়া হচ্ছে আর যন্ত্র হাতে নিয়ে ঠিক কতটা দূরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। থার্মোমিটারে এই ব্যাপারটাকে বোঝানো হয় ৪:১, ৮:১ এরকম সব অনুপাত দিয়ে। প্রশ্ন হতে পারে এসবের মানেটা কী? ব্যাপারটা এরকম। কোনও থার্মোমিটারে ৪:১ লেখা আছে মানে শরীরের কোনও একটা অংশ থেকে ১ সেন্টিমিটার ব্যাসের গোলাকার একটা অঞ্চল বেছে নিয়ে সেখান থেকে আসা অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে নির্ভুলভাবে তাপমাত্রা মাপতে হলে যন্ত্রটাকে খুব বেশি হলে ৪ সেন্টিমিটার দূরে রাখা যাবে। সেরকমই ৮:১ লেখা থার্মোমিটার দিয়ে ঐ ১ সেন্টিমিটার ব্যাসের অঞ্চল থেকে রশ্মি নিয়ে নির্ভুল তাপমাত্রা মাপতে হলে ৮ সেন্টিমিটার দূরে দাঁড়াতে হবে। অর্থাৎ অনুপাত যত বেশি হবে, তত বেশি দূরত্ব থেকে তাপমাত্রা সঠিকভাবে মাপা যাবে। তাই সাধারণত খুব বেশি তাপমাত্রা মাপতে হলে বড় অনুপাতের থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়।

আরেকটা বিষয় খুব জরুরি। এক-একটা থার্মোমিটার তাপমাত্রার এক-একটা পাল্লায় কাজ করে। কোনও থার্মোমিটার হয়তো ১০° সেলসিয়াস থেকে ৯০° সেলসিয়াসের মধ্যে কাজ করে। কোনটা হয়তো ৫০° সেলসিয়াস থেকে ২০০° সেলসিয়াসের মধ্যে কাজ করে। সুতরাং, আমি ঠিক কীরকম তাপমাত্রা মাপব সেটা আন্দাজ করে নিয়ে সেই অনুযায়ী থার্মোমিটার বেছে নেওয়াটা দরকার। পাল্লার বাইরের উষ্ণতা মাপতে গেলে কিন্তু যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মোটামুটিভাবে এই হল ইনফ্রারেড থার্মোমিটারের কথা।

লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: anindya05@gmail.com • M. 9432220412

পত্রিকা যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান

রবি সাহা, ২ নং ডেকার্স লেন, কলকাতা-৬৯ M. 8961066724 • স্টুডিও ইউনিক, কাঁচরাপাড়া M. 9332280602 • জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ বারাকপুর M. 8017402774/9331035550 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 • কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 • নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 • উৎপল মুখোপাধ্যায় , বারাসাত M. 9830518798 • ভোলানাথ হালদার , বনগাঁও M. 8637847365, অজয় মজুমদার M. 8918824281 • শিয়ালদহ ও যাদবপুর , রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যাণী, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, বাদকুল্লা, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) • গৌতম শিরোমনি M. 7364874673 • শকুন্তলা মুখার্জী, বনগাঁও M. 8116480129, সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ, বামা পুস্তকালয়, M. 9434570130 • অনিশ মিত্র, দুর্গাপুর, M. 9093819373 • অরিন্দম রায়, বোলপুর, M. 7001857013 • সারথী চন্দ, শিলিগুড়ি, M. 9674031082 • উত্তম দাস, আলিপুরদুয়ার, M. 9382307460 • সবুজ পৃথিবী প্রযত্নে কোডেক্স, ৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯ • শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, M. 9609844676/7908341942 • ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, M. 9635995476 • দীপাঞ্জন দে, কৃষ্ণনগর ও চাপড়া, M. 9734067466 • বহরমপুর রেলওয়ে বুক স্টল ও বিশ্বাস বুক স্টল, বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড, M. 9474350231 • তাপস কুমার প্রামাণিক, নোভা, কলকাতা M. 9836133980 • দিলীপ দাস, বিজ্ঞান ভাবনা, বহরমপুর M. 8926454316

ড. গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলী

রাশির মজা

আজ থেকে ৩৫ বছর আগের কথা, তখন আমি আচার্য দুর্গা প্রসন্ন স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাচর্চা করি। একদিন সপ্তম শ্রেণিতে পাঠদান করছি, পাঠদানের বিষয় Middle term factor। খুলে বললে দাঁড়ায় ax^2+bx+c-কে উৎপাদকে ভাঙতে হবে।

অর্থাৎ $ax^2+bx+k = (cx+d)(lx+m)$

যেখানে a, b, k, c, d, l, m পূর্ণসংখ্যা।

সাধারণত ছোট শ্রেণিতে $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ জাতীয় অমূলদ সংখ্যা থাকে না কারণ তাদের অমূলদ সংখ্যার ধারণা নেই বলে।

আলোচনাকে সরল করার জন্য middle term factor-এর উদাহরণে আসি।

যেমন $x^2-5x+6 = (x-2)(x-3)$

আবার $2x^2-5x+3 = (2x-3)(x-1)$

সেদিন অঙ্ক করাতে করাতে হঠাৎ লক্ষ্য করি পরপর দুটি অঙ্ক x^2-5x+6 এবং x^2+5x-6. অঙ্ক দুটি করতে দেওয়াতে ছাত্ররা দ্বিধাগ্রস্ত হয়, একটি ঠিক করলেও অপরটি ভুল হয় এবং দুটি অঙ্কের উত্তর একই করে তারা। তখন মনে হল বিষয়টিকে তাদের ভাল করে বোঝানো দরকার, পাশাপাশি ভাবনার নতুন জানলা খুলে গেল অর্থাৎ এই ধরনের রাশিমালা কিভাবে তৈরি করা যায় যাতে চিহ্ন বদলে দিলেও ছাত্ররা তাদের মত করে উৎপাদকে ভাঙতে পারে। খুঁজতে খুঁজতে এমন অসংখ্য উদাহরণ বেরিয়ে এল যেমন—

1. $x^2-13x+30$, $x^2+13x-30$
2. $x^2-29x+210$, $x^2+29x-210$

চেষ্টা চলল শেষটা দেখার। মনে হল এলোপাথাড়ে না খুঁজে যদি কোন সূত্র তৈরি করা যায়। চেষ্টার ফসল হিসেবে সূত্রটি তৈরি হল। সূত্রটি এইরূপ

$x^2-(a^2+4a+8)x+2a(a+2)(a+4)$

এখানে a-এর মান যেকোন পূর্ণসংখ্যা বসালে

$x^2-(a^2+4a+8)x+2a(a+2)(a+4)$

এবং $x^2+(a^2+4a+8)x-2a(a+2)(a+4)$

রাশিমালা দুটিতে (x+c) এবং (x+d) জাতীয় উৎপাদকে ভাঙা যাবে যেখানে c এবং d পূর্ণসংখ্যা।

ধরা যাক a = 7

তাহলে রাশিমালাদ্বয় হবে

$x^2-85x+1386$

এবং $x^2+85x-1386$

আর উৎপাদকে ভাঙলে

$x^2-85x+1386 = (x-63)(x-22)$

এবং $x^2+85x-1386 = (x+99)(x-14)$

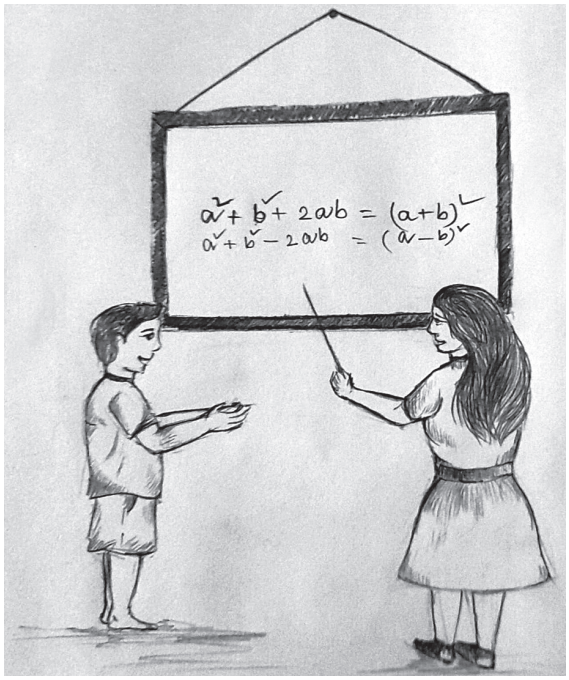

অংকন : প্রণয় কর্মকার

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি চিহ্ন বদলালে সব সময় ওদের মত করে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় না। যেমন

$x^2-7x+12 = (x-3)(x-4)$

কিন্তু চিহ্ন বদলে দিলে

$x^2+7x-12$-কে (x+c) (x−d)

আকারে লেখা যায় না, যেখানে c ও d পূর্ণসংখ্যা।

এখানে শেষ না করে আর একটু এগোতে ইচ্ছে হল। ফলশ্রুতি হিসেবে পেলাম আর একটি সূত্র যার দ্বারা দুটি বর্গের গড় একটি বর্গসংখ্যা হবে।

সূত্রটি $\dfrac{\left(a^2-8a+8\right)^2+\left(a^2-8\right)^2}{2} = \left(a^2-4a+8\right)^2$

যেখানে a পূর্ণসংখ্যা।

ধরা যাক a = 5 সেক্ষেত্রে $\dfrac{7^2+17^2}{2} = 13^2$

এখানেও বলি সব বর্গের গড় বর্গ হয় না।

যেমন $\dfrac{2^2+4^2}{2} = 10$ যা বর্গ নয়।

বি:দ্র: কাঠিন্য বর্জন করার জন্য প্রমাণটি সংযোজিত হয় নি। বিস্তারিত প্রমাণটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের গণিত চর্চাতে প্রকাশিত হয়েছিল নবম বর্ষ/চতুর্থ সংখ্যা/১৯৯০ সংখ্যায়।

লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: dr.gopalkg@gmail.com • M. 7980726276

দি গ ন্ত পা ল

স্পেস-টাইম কন্টিনিউয়াম

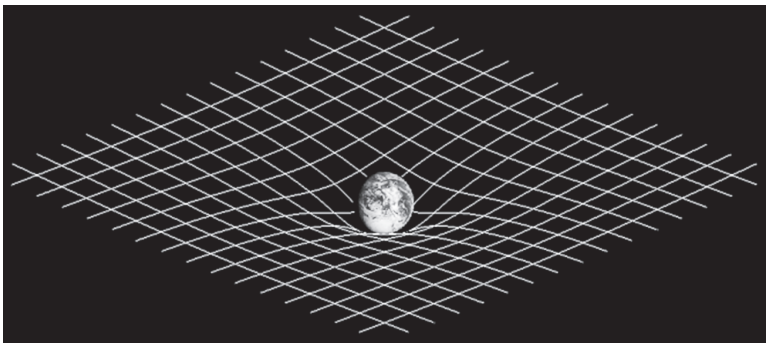

পদার্থবিদ্যার বহু শাখা যেমন 'ক্লাসিকাল মেকানিক্স', 'স্পেশাল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি', 'জেনারেল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি' ইত্যাদির ভিত হলো 'স্পেস-টাইম কন্টিনিউয়াম'। সহজ করে বললে 'স্পেস-টাইম কন্টিনিউয়াম' হলো স্পেস বা ব্যাপ্তি বা দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য এবং টাইম বা সময় পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে গড়ে ওঠা এমন এক পরিকাঠামো যাকে প্রেক্ষাপট (ব্যাকগ্রাউন্ড) হিসাবে ব্যবহার করে সকল প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে চলেছে বলে আমাদের ধারণা হয়।

কখনও ভেবে দেখেছেন যে কেন মানুষের বাস্তব চেতনা শুধু দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব মাত্রা ও সময় মাত্রার বেড়াজালে আবদ্ধ? কেন আমাদের উপলব্ধি 'স্পেস-টাইম কন্টিনিউয়াম' প্রেক্ষাপট ছেড়ে বেরোতে পারে না? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পদার্থবিদ্যা নিজেই হোঁচট খায়। তবে পদার্থবিদ্যার প্রসূতি যা অর্থাৎ মনুষ্য-মস্তিষ্ক, সেটির গভীরে প্রবেশ করলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়! এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে মনুষ্য-মস্তিষ্কের গঠনে ও 'গামা মস্তিষ্ক-তরঙ্গ'-এ।

'গামা মস্তিষ্ক-তরঙ্গ' কি তা প্রথমে বুঝে নিই। মানুষের মস্তিষ্ক অজস্র স্নায়ুকোষ বা 'নিউরোন' এবং বেশ কিছু স্নায়ুকোষের সাহায্যকারী কোষ বা 'গ্লিয়াল কোষ' নিয়ে তৈরি হয়। স্নায়ুকোষের প্রধানত তিনটি অংশ থাকে—গোলাকার অংশটি যেখানে নিউক্লিয়াস থাকে তাকে 'কোষ দেহ' বা 'সোমা' বলে, কোষ দেহ থেকে নির্গত সরু ও লম্বা সুতোর মত অংশটি 'অ্যাক্সন' নামে পরিচিত, এবং কোষ দেহ থেকে প্রবর্ধিত ছোট ছোট ও অসংখ্য শাখায় বিভক্ত অংশগুলির প্রতিটিকে আমরা 'ডেনড্রাইট' নামে জানি।

প্রতিটি স্নায়ুকোষের কোষদেহ যে পর্দা দ্বারা ঢাকা থাকে তা 'প্লাজমা পর্দা' বা 'প্লাজমা মেমব্রেন' নামে পরিচিত। স্নায়ুকোষের অ্যাক্সনও প্লাজমা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে, অ্যাক্সন-র প্লাজমা পর্দার বিশেষ নাম 'অ্যাক্সোলেমা'। কোনো বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ কারণে মস্তিষ্কের কোনো নির্দিষ্ট স্নায়ুকোষের উদ্দীপিত হওয়ার অর্থ হলো ঐ স্নায়ুকোষের কোষ দেহের প্লাজমা পর্দায় যে স্থির তাড়িতিক বিভব বিদ্যমান তার বৃদ্ধি ঘটা। বিভবের এই বৃদ্ধি 'অ্যাকশন' ও 'পোটেনশিয়াল' নামে পরিচিত যা স্নায়ুকোষটির কোষ দেহের প্লাজমা পর্দায় সংঘটিত হওয়ার পর স্নায়ুকোষটির অ্যাক্সন-র দৈর্ঘ্য বরাবর অ্যাক্সনটির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অ্যাক্সোলেমা-র একের পর এক অঞ্চলগুলিতে ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হয়। এরপর ঐ অ্যাক্সন-র শেষ প্রান্তের লাগোয়া সাইন্যাপ্স (একটি স্নায়ুকোষের অ্যাক্সন-র শেষ প্রান্ত বা একটি ডেনড্রাইট-র প্রান্ত এবং আরেকটি স্নায়ুকোষের একটি ডেনড্রাইট-র প্রান্তের সংযোগস্থল 'সাইন্যাপ্স' নামে পরিচিত) সক্রিয় হয়ে ওঠে ও সেখানে 'নিউরোট্রান্সমিটার' নামক রাসায়নিক পদার্থের ক্ষরণ ঘটে। সাইন্যাপ্স-টির লাগোয়া আরও এক বা একাধিক স্নায়ুকোষ তাদের ডেনড্রাইট-এ উপস্থিত 'নিউরোট্রান্সমিটার-রিসেপ্টর'-র সাহায্যে সেই নিউরোট্রান্সমিটার গ্রহণ করায় সেই স্নায়ুকোষগুলিরও কোষ দেহের প্লাজমা পর্দায় স্থির তাড়িতিক বিভব-বৃদ্ধি ঘটে অর্থাৎ সেই স্নায়ুকোষগুলিও উদ্দীপিত হয়। এইভাবে কোন বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ কারণে কতগুলি স্নায়ুকোষের একই সাথে অথবা একটি ক্রমে উদ্দীপিত হয়ে ওঠা 'উপলব্ধি'-র (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা অথবা কিছু স্মরণ করা অথবা যুক্তির ভিত্তিতে নতুন কিছু ভাবা অথবা স্বজ্ঞা অথবা কল্পনা) পরিভাষা। হারমোনিয়ামের কিবোর্ড-র উপর বাদকের চঞ্চল আঙুলগুলোকে লক্ষ্য করবেন—কিভাবে আঙুলগুলো হারমোনিয়ামের কি-গুলিকে ছন্দবদ্ধভাবে আঘাত করে চলে। একই সাথে অথবা একটি ক্রম ছাড়াও মস্তিষ্কের কিছু স্নায়ুকোষ কখনও কখনও এরকম ছন্দবদ্ধভাবেও উদ্দীপিত হয়।

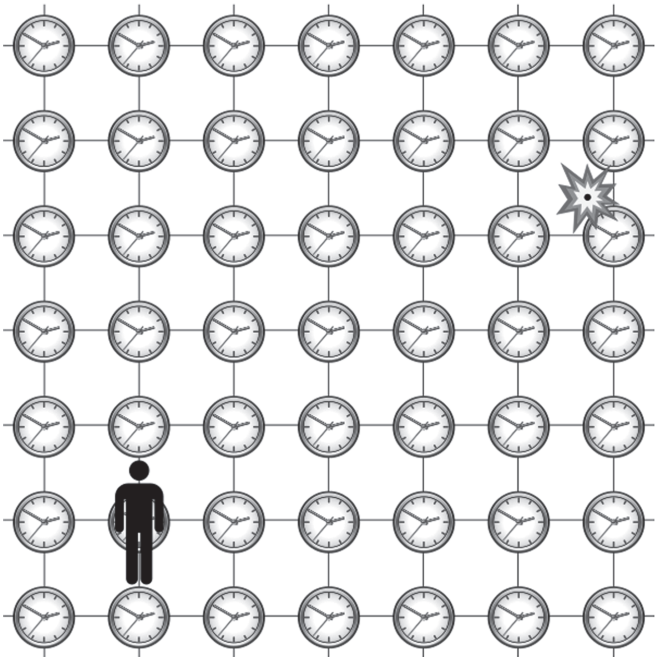

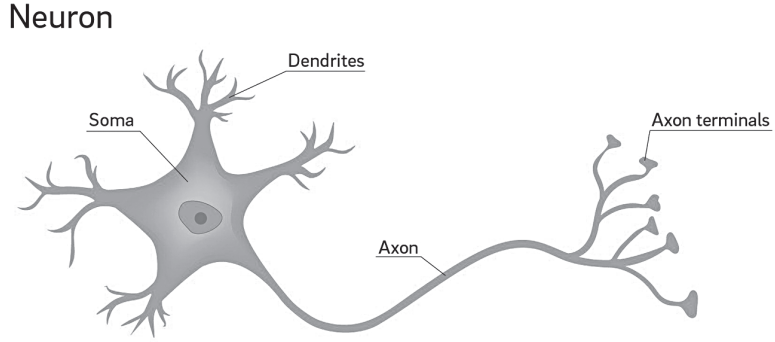

স্নায়ুকোশ

এক্ষেত্রে ঐ স্নায়ুকোষগুলির প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর পরই বারবার উদ্দীপিত হয় — স্নায়ুকোষগুলির উদ্দীপিত হওয়ার এই ছন্দকে 'মস্তিষ্ক-তরঙ্গ' বলে যা কম্পাঙ্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে।

এখনও পর্যন্ত মানুষের মস্তিষ্কে যত প্রকারের মস্তিষ্ক-তরঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী কম্পাঙ্কের মস্তিষ্ক-তরঙ্গ হলো 'গামা মস্তিষ্ক-তরঙ্গ' (৪০-১০০ হার্ৎজ কম্পাঙ্ক) যা ঘুমানোর সময়ে অথবা জাগ্রত বা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অন্যান্য মস্তিষ্ক-তরঙ্গের পাশাপাশি আমাদের মস্তিষ্কে খেলে বেড়ায়।

আমাদের মস্তিষ্কের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য ও গামা মস্তিষ্ক-তরঙ্গ কিভাবে 'স্পেস-টাইম কন্টিনিউয়াম' ধারণার জন্ম দেয় তা এখন আমরা বুঝবো। নিরুদ্বেগ জাগ্রত অবস্থা, সতর্ক জাগ্রত অবস্থা, নিদ্রাবস্থা, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখা, ঘুম থেকে জেগে ওঠা, ধ্যানমগ্ন অবস্থা, ও গভীরতর ধ্যানমগ্ন অবস্থা—আমাদের মস্তিষ্কের এই বিভিন্ন অবস্থাগুলো এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগ্রহ করা বিভিন্ন উদ্দীপনা মস্তিষ্কের যে সকল অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলির মধ্যে প্রধান হলো 'সেরিব্রাল কর্টেক্স',

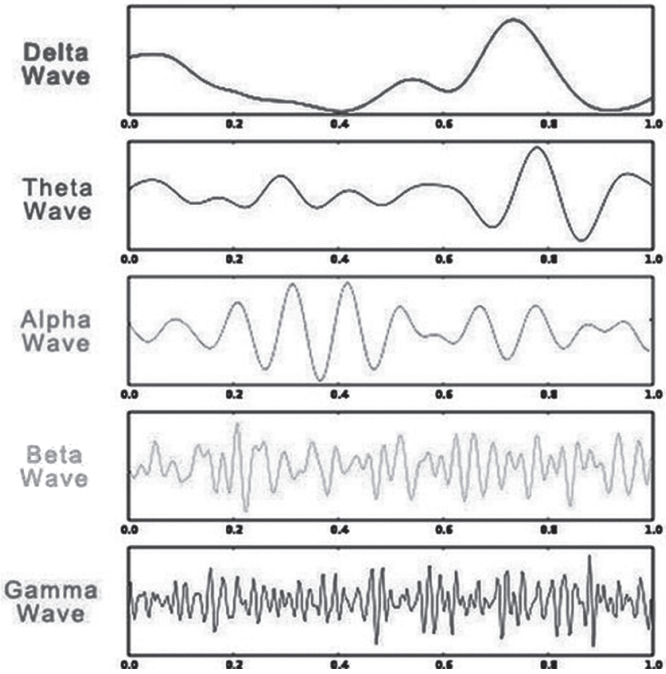

ইলেকট্রো এন্সাফেলোগ্রাম যন্ত্রে সনাক্ত বিভিন্ন প্রকার মস্তিষ্ক তরঙ্গ

'থ্যালামাস', ও 'মিডব্রেইন' যেগুলি একে অপরের সাথে বেশ কিছু নিউরাল লুপ-র (নিউরাল লুপ হলো কতগুলি স্নায়ুকোষের সমষ্টি যেখানে স্নায়ুকোষগুলি একটি সিরিস বা ক্রমে সংযুক্ত থেকে কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার জন্য উদ্দীপনাকে মস্তিষ্কের এক অংশ থেকে অন্য অংশে নিয়ে যায়) মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে।

নিউরাল লুপ-এ উপস্থিত প্রতিটি স্নায়ুকোষের প্লাজমা পর্দার নিজস্ব রোধ (রেসিসটেন্স), আবেশাঙ্ক (ইন্ডাক্টেন্স), ও ধারকত্ব (ক্যাপাসিটেন্স) আছে। নিউরাল লুপ-এ উপস্থিত প্রতিটি স্নায়ুকোষের প্লাজমা পর্দার আবেশাঙ্ক ও ধারকত্বের জন্যই নিউরাল লুপ-টিতে মস্তিষ্ক-তরঙ্গের প্রবাহের সময়ে নিউরাল লুপ-টির প্রতিটি স্নায়ুকোষের প্লাজমা পর্দায় যথাক্রমে আবেশীয় রোধ (ইন্ডাক্টিভ রিয়্যাকটেন্স) ও ধারকীয় রোধ (ক্যাপাসিটিভ রিয়্যাকটেন্স) তৈরি হয় যেগুলিকে প্লাজমা পর্দার রোধের সাথে সম্মিলিতভাবে প্লাজমা পর্দার 'ইম্পিডেন্স' বলে। নিউরাল লুপ-র প্রতিটি স্নায়ুকোষের প্লাজমা পর্দার আবেশীয় রোধ ও ধারকীয় রোধ প্লাজমা পর্দার বেধ ছাড়াও মস্তিষ্ক-তরঙ্গের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে বলে এই ইম্পিডেন্স-ও প্লাজমা পর্দার বেধ ও মস্তিষ্ক-তরঙ্গের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভরশীল হয়। নিউরাল লুপ-এ মস্তিষ্ক-তরঙ্গের প্রবাহের সময়ে সিরিস বা ক্রমে সংযুক্ত থাকা একটি স্নায়ুকোষ থেকে পরবর্তী স্নায়ুকোষে পর্যায়ক্রমিক উদ্দীপনা-প্রবাহের বেগ স্নায়ুকোষের প্লাজমা পর্দার এই ইম্পিডেন্স দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই ইম্পিডেন্স-কে 'Z' অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করলে গাণিতিকভাবে আমরা বলতে পারি—

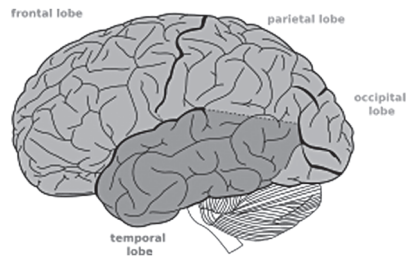

৪টি খণ্ডে বিভক্ত মস্তিষ্কের কর্টেক্স

$$Z = \sqrt{(R^2 + (|X_L - Xcl)^2)} \quad .....(১)$$

যেখানে :

$$X_L = 2\pi fL \quad .....(২)$$

$$X_C = 1/(2\pi fC \quad .....(৩)$$

'R', 'X_L', 'X_C' হলো নিউরাল লুপ-এ উপস্থিত প্রতিটি স্নায়ুকোষের প্লাজমা পর্দার যথাক্রমে রোধ, আবেশীয় রোধ, ও ধারকীয় রোধ;

'L' ও 'C' হলো নিউরাল লুপ-এ উপস্থিত প্রতিটি স্নায়ুকোষের প্লাজমা পর্দার যথাক্রমে আবেশাঙ্ক ও ধারকত্ব;

'f' হলো নিউরাল লুপ-এ প্রবাহমান মস্তিষ্ক-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক।

সেরিব্রাল কর্টেক্স ও থ্যালামাস সংযোগকারী যে নিউরাল লুপগুলিতে গামা মস্তিষ্ক-তরঙ্গ বয়ে চলে সেগুলি আমাদের মস্তিষ্কে 'স্পেস' বা 'স্থান' বা 'দৈর্ঘ্য' বা 'দূরত্ব'-র ধারণা সৃষ্টি করে, এবং গামা মস্তিষ্ক-তরঙ্গ বহনকারী যে নিউরাল লুপগুলি সেরিব্রাল কর্টেক্স-র সাথে মিডব্রেইন-কে সংযুক্ত করে সেগুলি মনুষ্য-মস্তিষ্কে 'টাইম' বা 'সময়'-র ধারণাকে জন্ম

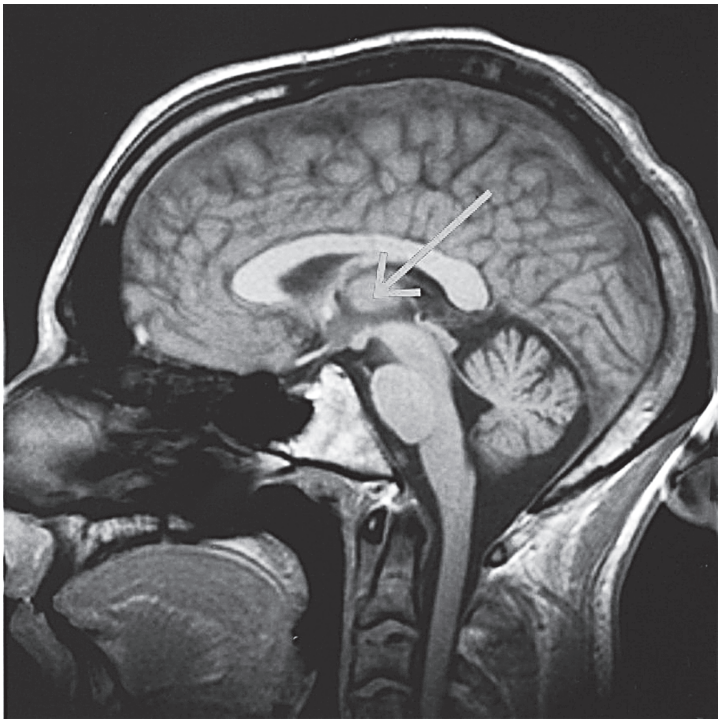

থ্যালামাস

দেয়। তবে প্লাজমা পর্দার বেধ সমান হয় না বলে সেরিব্রাল কর্টেক্স ও থ্যালামাস সংযোগকারী নিউরাল লুপগুলিতে উপস্থিত প্রতিটি স্নায়ুকোষের প্লাজমা পর্দার ইম্পিডেন্স, সেরিব্রাল কর্টেক্স ও মিডব্রেইন সংযোগকারী নিউরাল লুপগুলিতে উপস্থিত প্রতিটি স্নায়ুকোষের প্লাজমা পর্দার ইম্পিডেন্স-র সমান হয় না; তাই সাধারণ শর্তে গামা মস্তিষ্ক-তরঙ্গ প্রবাহিত হলে একটি স্নায়ুকোষ থেকে পরবর্তী স্নায়ুকোষে পর্যায়ক্রমিক উদ্দীপনা-প্রবাহের বেগ উভয় প্রকার নিউরাল লুপ-এ সমান হয় না। এই বৈষম্য উৎপন্ন 'স্পেস'-র ধারণা ও 'টাইম'-র ধারণার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার (কোরিলেশন) অন্তরায় হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রকৃতি আমাদের মস্তিষ্কের সেরিব্রাল কর্টেক্স ও থ্যালামাস সংযোগকারী নিউরাল লুপগুলিতে এবং সেরিব্রাল কর্টেক্স ও মিডব্রেইন সংযোগকারী নিউরাল লুপগুলিতে প্রবাহমান গামা মস্তিষ্ক-তরঙ্গের এমন কম্পাঙ্ক নির্বাচন করেছে যাতে XL = XC হয় কারণ XL = XC হলে (১) নং সমীকরণানুসারে ইম্পিডেন্স (Z) এর মান যথেষ্ট কমে যায় (Z = R)।

$X_L = X_C$

বা, $2\pi fL = 1/(2\pi fC)$ [(২) ও (৩) সমীকরণানুসারে]

বা, $f = 1\ (2\pi\ \sqrt{LC})$

অর্থাৎ সেরিব্রাল কর্টেক্স ও থ্যালামাস সংযোগকারী নিউরাল লুপগুলিতে উপস্থিত প্রতিটি স্নায়ুকোষের প্লাজমা পর্দার আবেশাঙ্কের মান L1 ও ধারকত্বের মান C1 হলে নিউরাল লুপগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহমান গামা মস্তিষ্ক-তরঙ্গের কম্পাঙ্কের মান হয় $1/(2\pi\ \sqrt{L_1C_1})$ যাকে সেরিব্রাল কর্টেক্স ও থ্যালামাস সংযোগকারী নিউরাল লুপগুলির জন্য 'অনুরণিত কম্পাঙ্ক' (রেসোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি) বলে। একই রকমভাবে সেরিব্রাল কর্টেক্স ও মিডব্রেইন সংযোগকারী নিউরাল লুপগুলিতে উপস্থিত প্রতিটি স্নায়ুকোষের প্লাজমা পর্দার আবেশাঙ্কের মান L2 ও ধারকত্বের মান C2 হলে নিউরাল লুপগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহমান গামা মস্তিষ্ক-তরঙ্গের কম্পাঙ্কের মান হয় $1/(2\pi\ \sqrt{L_2C_2})$ যা হলো সেরিব্রাল কর্টেক্স ও মিডব্রেইন সংযোগকারী নিউরাল লুপগুলির জন্য উপযুক্ত অনুরণিত কম্পাঙ্ক। ফলে সেরিব্রাল কর্টেক্স, থ্যালামাস, ও মিডব্রেইন সংযোগকারী সকল নিউরাল লুপ-এ প্রবাহমান গামা মস্তিষ্ক-তরঙ্গের উপর ক্রিয়াশীল ইম্পিডেন্স-র মান খুব কম হয়। ইম্পিডেন্স উপেক্ষণীয় হলে গামা মস্তিষ্ক-তরঙ্গ প্রবাহিত হওয়ার সময়ে একটি স্নায়ুকোষ থেকে পরবর্তী স্নায়ুকোষে পর্যায়ক্রমিক উদ্দীপনা- প্রবাহের বেগ ঐ সকল নিউরাল লুপ-এ প্রায় সমান হয়। ফলস্বরূপ মনুষ্য-মস্তিষ্কে উৎপন্ন 'স্পেস' ও 'টাইম'-র ধারণা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল (কোরিলেটেড) হয়।

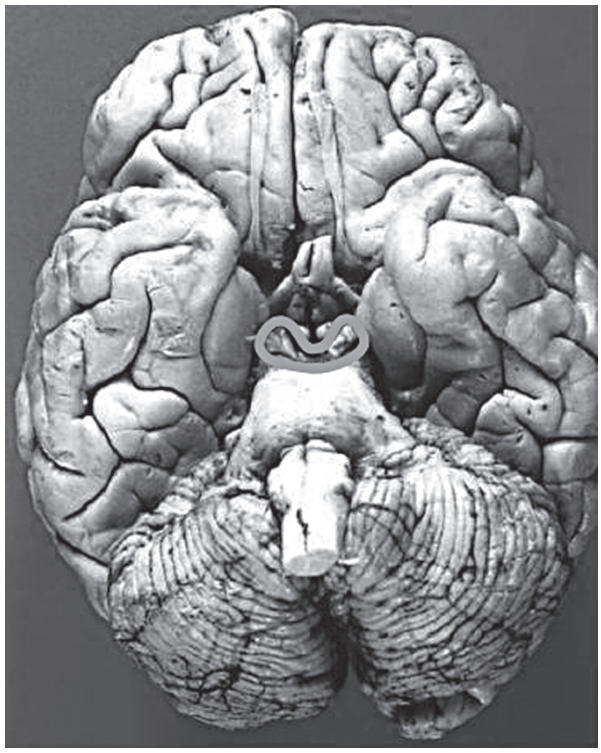

মিড ব্রেইন

অর্থাৎ গামা মস্তিষ্ক-তরঙ্গ আমাদের মস্তিষ্কে শুধু 'স্পেস' ও 'টাইম'-র ধারণারই জন্ম দেয় না, উল্লেখিত নিউরাল লুপগুলির মধ্যে অনুরণন (রেজোনেন্স) ঘটিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে তৈরি করে 'স্পেস-টাইম কন্টিনিউয়াম'-র ধারণা।

লেখক তথ্যপ্রযুক্তি পেশাদার ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: digantapaul5@gmail.com • *M. 9874556152*

ড. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

অ্যাডিনোভাইরাস : যে বিষয়গুলি ভাবাচ্ছে

সাম্প্রতিক সময়ে সর্দি-জ্বরে শিশুমৃত্যুর ঘটনা অনেককেই ব্যথিত ও চিন্তিত করেছে। সর্দি-কাশি ও নিউমোনিয়ার মত শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা শিশুদের বরাবরই ছিল। তবে এবার কী এমন হ'ল যে, সরকারী ও বেসরকারী শিশু হাসপাতালগুলোর বেডগুলো পূর্ণ হয়ে গেল; ছোটদের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট-এর প্রয়োজন হঠাৎ করে খুব বেড়ে গেল?

এই পরিস্থিতি কি, করোনা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্যারা-ইনফ্লুয়েঞ্জা, রেসপিরেটরি সিনশিটিয়াল বা অ্যাডিনো ভাইরাস-এর সংক্রমণের জেরে? কারণটা স্পষ্ট হচ্ছিল না। আক্রান্ত শিশুদের থেকে নমুনা (স্যাম্পেল) নিয়ে এতে ভাইরাসের উপস্থিতি সঠিকভাবে জানতে ভাইরাসের 'জিন সিকোয়েন্সিং' পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আইসিএমআর এর গবেষণা সংস্থা 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা এণ্ড এনটেরিক ডিসিসেস (নাইসেড)'-এ নমুনা পাঠানো হয়।

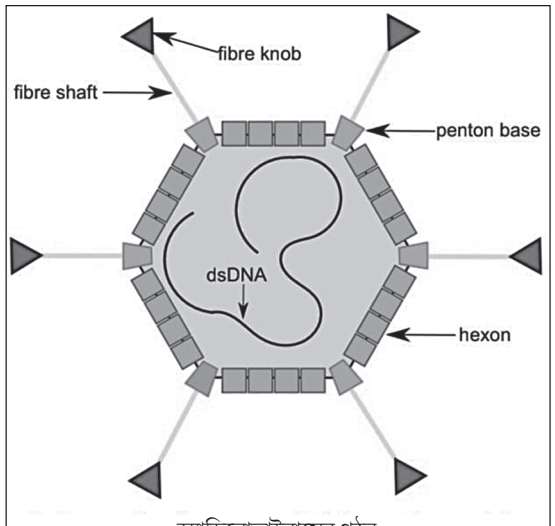

অ্যাডিনোভাইরাসের গঠন

১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নাইসেড-এ যে ৫০০-র কিছু বেশি নমুনা গিয়েছিল, তার মধ্যে প্রায় ১৫০ (৩০%) নমুনায় মিলেছে অ্যাডিনোভাইরাস। এর মধ্যে ৪০টি নমুনার জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ে দেখা গিয়েছে, সিংহভাগ নমুনাতেই মিশে রয়েছে অ্যাডিনো-৩ ও অ্যাডিনো-৭ সেরোটাইপের অ্যাডিনোভাইরাস। জিন বিশ্লেষণ করে একই নমুনায় ৩ ও ৭ নম্বর সেরোটাইপের যুগপৎ অস্তিত্বের প্রমাণও মিলেছে। এই দু'টি সেরোটাইপের একটি মারাত্মক সংক্রামক এবং অন্যটি মারাত্মক মারমুখী। অর্থাৎ, এবারের অ্যাডিনো ধারে-ভারে অনেক বেশি শক্তিশালী। আর সে জন্যই এই দুই সেরোটাইপের মিলিত হামলায় কাহিল হয়ে পড়ছে বাংলার শিশুরা। এর নানা কারণ, এমনিতেই ছোটদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল। একদিকে যেমন দূষণের পাশাপাশি করোনার জন্য (বাড়িতে বন্দি থাকায় জীবাণুদের সঙ্গে পরিচিত না হওয়ার কারণে) 'ইমিউনিটি গ্যাপ' তৈরি হয়েছে, আবার অন্যদিকে, করোনার এই মিশ্র প্রকার বা রিকম্বিনেন্ট স্ট্রেনের জেরেই দ্রুত ছড়ানোর পাশাপাশি মারমুখী করেছে অ্যাডিনোভাইরাসকে।

এখন অ্যাডিনোভাইরাস সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেওয়া যাক। এই প্রাথমিক ধারণা রোগটির গভীরতা ও আমাদের করণীয় কী, তার খোরাক জোগাবে।

মানুষের গলার অ্যাডিনয়েড গ্রন্থিতে প্রথম পাওয়া যাওয়ায়, এই ভাইরাসের নাম অ্যাডিনোভাইরাস। অ্যাডিনোভাইরাস ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক আকার 'আইকোসাহেড্রন' গড়নের এবং ৭০-১০০ ন্যানোমিটারের একটি ডিএনএ ভাইরাস।

মানুষ ছাড়াও অ্যাডিনোভাইরাস কুকুর, বিড়াল, গবাদি প্রাণী, ঘোড়া, পাখি, বিভিন্ন সরীসৃপ প্রাণী তথা মাছে রোগ সৃষ্টি করে।

মানুষের অ্যাডিনোভাইরাস মাস্টাডেনো জেনাস (মহাজাতি) এর অন্তর্ভুক্ত এবং সাতটি (A থেকে G পর্যন্ত) প্রজাতি সম্বলিত। এই সাতটি প্রজাতির মধ্যে এখন পর্যন্ত মোট ৬৮ প্রকার (সেরোটাইপের) অ্যাডিনোভাইরাসের খোঁজ পাওয়া গেছে। অ্যাডিনোভাইরাস শ্বাসনালী তথা ফুসফুসের সংক্রমণ ও প্রদাহ ছাড়াও পরিপাক তন্ত্র, মূত্রনালী তথা রেচনতন্ত্র এবং চোখের কনজাংটিভার সংক্রমণ ও প্রদাহ করতে পটু। তবে এ ব্যাপারে সব ধরনের অ্যাডিনোভাইরাস সমান দক্ষ নয়। রেসপিরেটরি ইনফেকশন মূলত ঘটায় ১, ২, ৩, ৫, ৬ এবং ৭ সেরোটাইপের অ্যাডিনোভাইরাস।

অ্যাডিনো ডিএনএ ভাইরাস হওয়ায় কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে বংশ বিস্তার করে এবং শরীরের প্রতিরোধী ব্যবস্থাপনাকে ফাঁকি দিয়ে টনসিল ও অ্যাডিনয়েড এর মত লিম্ফয়েড টিস্যুতে বহুদিন পর্যন্ত থেকে যায়। এই ভাইরাসের বাইরে বেরিয়ে থাকা কিছু প্রত্যঙ্গ (পরিভাষায়, পেন্টন ফাইবারের নব্) এদের রিসেপ্টর (কার, সিডি-৪৬, সিডি-৮০/৮৬, সায়ালিক অ্যাসিড, প্রোটিওগ্লাইক্যান ইত্যাদি) সহযোগে কিছু বিশেষ কোষকে আক্রমণের জন্য বেছে নেয়। এদের মধ্যে রয়েছে লিম্ফয়েড কোষ, চোখের কনজাংটাইভার কোষ ইত্যাদি। এর জেরে তৈরি হয় প্রবল কোষীয় সংক্রমণ ও প্রদাহ, যা হয় দীর্ঘস্থায়ী। এরা আক্রান্ত কোষের মৃত্যুকে ঠেকিয়ে নিজেদের আধিপত্য বহুদিন বজায় রাখতে পারে। তাই বড়দের খুব বেশি কাবু করতে না পারলেও টনসিল ও ফ্যারিংসে অনেকদিন থেকে যাওয়ায় কাশি সারতে চায় না। প্রতিকূল আবহাওয়ায় শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমলে শ্বাসনালীর উপরের অংশে বসবাসকারী আপাত নিরীহ জীবাণুরাও বংশে তথা সংখ্যায় বাড়ে ও দাদাগিরি শুরু করে। এতে শরীর খারাপ বেড়ে যায়।

এই ধরনের ভাইরাসঘটিত রোগের প্রার্দুভাব রুখতে জনসচেতনতার পাশাপাশি সংক্রামক রোগের উপর গবেষণা তথা এপিডেমিওলজিক্যাল নজরদারী নিরন্তরভাবে চালানো প্রয়োজন, কারণ জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণের সঙ্গে ভবিষ্যতে জীবাণু ও ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত ঘটতে চলেছে। এর জেরে জনস্বাস্থ্যের সমস্যা আগামীদিনে আরও প্রকট হবে। দুই বছরের ছোট বাচ্চাদের বাবা-মার দায়িত্ব এখন বেড়ে গেছে। তারা যে 'বাহক' হতেই পারেন, এটা বুঝতে হবে। যথাসম্ভব তাদের সঙ্গে বাচ্চাদের সরাসরি সংশ্রব এড়াতে হবে।

লেখক পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ভাইরাস বিশেষজ্ঞ
• *M. 9231533335*

অসিত ঘোষ

বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন

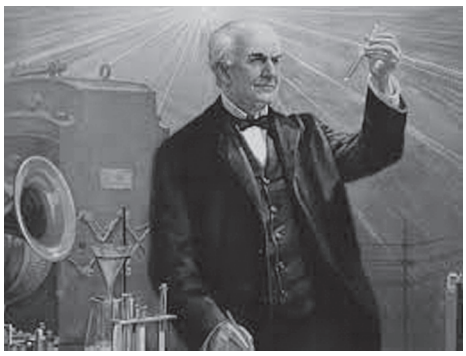

বিধবা মায়ের ৭/৮ বছরের ছেলেটি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে একগাল হাসিতে মাকে বলল, প্রিন্সিপ্যাল আদর করে আজকে কয়েকটা ক্যান্ডি দিয়েছেন আর তোমার জন্য এই চিঠিটা দিয়েছেন। মা, ন্যান্সি ম্যাথিউস এলিয়ট এডিসন চিঠিখানা খুলে পড়ে কেঁদে ফেললেন। মায়ের চোখে জল দেখে ছেলেটি বললে—কাঁদছ কেন মা? চোখ মুছতে মুছতে মা বললেন—আনন্দের কান্না, বাবা। ছেলেকে চুমু দিয়ে বললেন; আমার জিনিয়াস ছেলে, তুমি। চিঠিটা এবার পড়ে শোনাই...

মা, নিজেও স্কুল শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তিনি চিঠির ভাষা নিজের মত বদল করে চিৎকার করে পড়তে লাগলেন। '—ম্যাম, আপনার ছেলেটি সাংঘাতিক জিনিয়াস। আমাদের এই ছোট্ট স্কুলে ওকে শিক্ষা দেওয়ার মত শিক্ষক নেই। তাই যদি পারেন আপনার ছেলে, টমাস-কে অন্য কোন বড় স্কুলে ভর্তি করে দিলে ভাল হয়। আমাদের বিশ্বাস, টমাস একদিন বিশ্বে অনেক অনেক সম্মান, সুনাম অর্জন করবে।' চিঠিটি পড়া শেষ করে মা বললে, জিনিয়াস ছেলেকে তিনিই পড়াবেন, আর কোন স্কুলে ভর্তি করাবেন না। মার কাছেই ছেলেটি স্কুলশিক্ষা পেয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তথা সমগ্র বিশ্বে এক অনন্য শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হয়েছিলেন। একক বা যৌথভাবে ১০৯৩টি উদ্ভাবনের জন্যে পেটেন্ট পেয়েছিলেন যা তামাম বিশ্বে রেকর্ড। প্রতিভাধর এই বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন; তাঁর ব্যক্তিজীবন, কর্মসাধনা একইসঙ্গে উল্লিখিত চিঠির সত্যতার বিবরণ এবার আলোচনায় আসব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলান শহরে ওহাইও-তে, তিনি ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ খ্রি. এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা, স্যামুয়েল ওডেন এডিসন (জুনিয়র)-র সপ্তম বা শেষ সন্তান তিনি ছিলেন। অল্প বয়েস থেকেই পারিবারিক প্রবণতার কারণে কানে কম শুনতেন যা তাঁর ছেলেবেলা এবং কর্মজীবনকে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করেছিল। এছাড়া ছাত্রজীবনে বড়ই চঞ্চল ও একগুঁয়ে মনোভাবের ছিলেন। ফলে স্কুলের শিক্ষকদের সর্বদা অতিষ্ঠ করে রাখতেন। আর বেপরোয়া মানসিকতার জন্য কখনো কারও বাধ্যগত থাকতেন না। পিতা স্যামুয়েল, পেশায় সামরিক পোস্টে বাতিঘর রক্ষক ছিলেন। অবসরে কাঠ মিস্ত্রির কাজ করে সাংসারিক প্রয়োজন মেটাতে হতো। এজন্য ছেলেদের ঠিকমত দেখাশুনা করতে পারতেন না। কথিত সন্তান মানসিক অবসাদগ্রস্ত বলে এক স্কুল থেকে অন্য পাঁচটা স্কুলে ভর্তি করা এবং বাড়িতে লেখাপড়ার পরিবেশ থাকায় বালক টমাসের বিক্ষিপ্তভাবে প্রথামাফিক কিছু পড়াশুনা হয়েছিল। আবার বলছি, টমাসের কল্পনাপ্রসূত ও অনুসন্ধিৎসু মন আর কানে শুনতে অসুবিধে থাকা, এসব কারণে স্কুলের টিচাররা প্রায়শই বিরক্ত হয়ে তাকে মিসফিট বলে চিহ্নিত করেছিল। যাইহোক, মায়ের পরিচর্যায় পুষ্ট ও শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়েছিল বিজ্ঞানী টমাসের বাল্যজীবন ও প্রতিভা বিকাশ ক্ষেত্র হিসেবে ছোটবেলা থেকেই কৌতুহলী হওয়ায় বেশিভাগ বিষয় নিজে অনুশীলন করে শিখেছিলেন। একই সত্য বহুভাবে অনেক মনীষীর জীবনেই প্রমাণিত হয়েছে। এমনকি শৈশব থেকেই তিনি প্রযুক্তির প্রতি আকৃষ্ট হন। এদিকে, বয়েস বছর বারো হবে, তখন বাড়িতেই নিয়ম করে পাঠাভ্যাস চলছে; তারমধ্যে নিজ খরচ মেটাতে রোজগারের উদ্দেশ্যে ট্রেনের কামরায় খবরের কাগজ বিক্রি, কখনো সিদ্ধকরা শাকসবজি বিক্রি করে, স্টেশনের কাছাকাছি বন্ধুর আস্তানায় কিছুসময় বিশ্রাম নিয়ে বাড়ি ফিরে নিজের মত পড়াশুনা চালানো, এইই ছিল তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস। একদিন ট্রেনের কিছু কামরায় খবরের কাগজ বিলি করে পোর্ট হুরণ স্টেশনে নেমে পরের ট্রেনের জন্য প্লাটফর্মে অপেক্ষা করছেন, এমন সময় তাঁর চোখ পড়লো সেই স্টেশনের স্টেশন-মাস্টারের ৩ বছরের ছেলে, জিমি ম্যাকেঞ্জি, লাইনের উপর খেলা করছে। এদিকে দ্রুতগামী ট্রেনটি প্লাটফর্মের দিকে আসছে দেখে কালবিলম্ব না করে ছুট দিয়ে ছেলেটিকে লাইনের উপর থেকে সরিয়েছে খবরের কাগজের জনৈক হকার,এডিসন, শিশুটিকে প্রাণে বাঁচিয়েছে, স্টেশনমাস্টার জানতে পেরে কৃতজ্ঞচিত্তে টেলিগ্রাফ অপারেটর হিসাবে (১৮৬২ খ্রি.) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেন। প্রশিক্ষণ শেষে, ১৮৬৬খ্রি.-এ ১৯ বছর বয়েসে, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রেলওয়ে স্ট্রাটফোর্ড জংশনে টেলিগ্রাফ অপারেটর পদে মাসে তিনশো ডলার মাইনেতে বহাল হলে টমাস এডিসনের অর্থকষ্ট অনেকটা লাঘব হওয়ায় বিজ্ঞান গবেষণায় প্রাণিত হয়ে উঠেন। ইতিমধ্যে দ্রুতগামী ও স্বয়ংক্রিয় টেলিগ্রাফ মেশিন সেখানেই নির্মাণ করে, চল্লিশ হাজার ডলারে বিক্রি করে ধনবান হওয়ায়, ১৮৭৬ খ্রি. নিউজার্সির মিনলো পার্কে একটি সাধারণ মানের পরীক্ষাগার স্থাপন করেন।

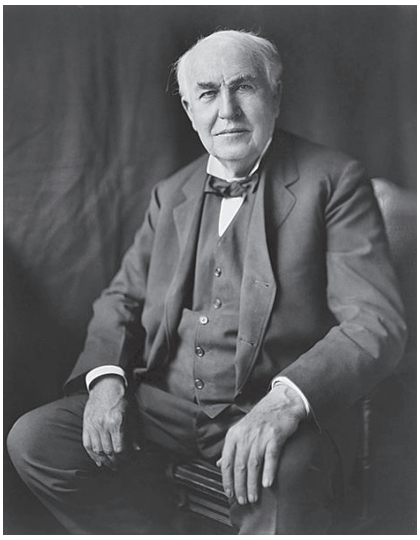

এদিকে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ সম্পর্কে ভালরকম ধারণা গড়ে উঠল। অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে উদ্ভাবনী শক্তি তাঁর সহজাত ছিলই। এখন নতুন

নতুন যন্ত্রপাতি নির্মাণের নেশায় মেতে উঠলেন। কিছুদিনের ভিতর সংকেত ধরা পড়বে সেরকম যন্ত্র তৈরি করে যন্ত্রবিদ হিসেবে নামডাক ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে সুনামের তলে বিপদের পাহাড় জড়ো হয়েছিল। যাইহোক সংকেত ধরার যন্ত্রে এখন নিজের কাজের সুবিধা হল। যখন তিনি থাকতেন না, আপনা থেকেই কাগজে টেলিগ্রাফ রেকর্ড হয়ে যেত। এই সুবিধা তাঁর বিপদের মহাকাল, অবিশ্বাস্য ঘটনাবর্ত আর আশ্চর্য পরিণতি ঘটিয়েছিল। ব্যাপারটা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আসায়, কর্তব্যে গাফিলতির অপরাধে তাঁর চাকরিটি খোয়াতে হয়। এডিসন এবারে নিউইয়র্ক চলে এসে এক বন্ধুর আস্তানায় রাতটা কাটিয়ে, দিনের বেলায় টো টো করে চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন।তবে পড়ালেখা আর অধ্যাবসায়ে কোন ঘাটতি ছিল না।

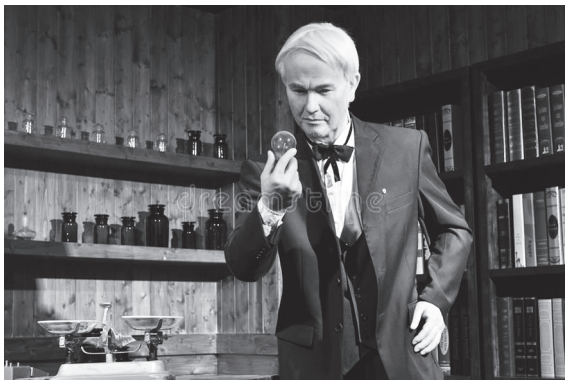

তখনকার দিনে ঘরে আলো জ্বালানো ব্যবসায় ডায়নামোর ব্যবহার প্রচলিত বিধি ছিল। তিনি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষায়, বায়ুনিরোধক কাচের বাল্বের ভিতর কার্বন ফিলামেন্ট রেখে তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে বাতি জ্বালাতে সমর্থ হলেন। বেশ কয়েকদিন ইচ্ছেমত একটানা বাতি জ্বালিয়ে দেখলেন, ফিলামেন্ট একই রয়ে গেল; পুড়ে গেল না। সেইযুগের মানুষের জীবনযাত্রা, এই আবিষ্কার সহজলভ্য ও আর্থিক সাশ্রয় ঘটায় আবার তিনি খ্যাতির একধাপ উপরে উঠে এলেন।

বিস্ময়কর এই কাজটি মিনলো পার্কের গবেষণাগার থেকে উদ্ভাবন হয়েছিল। লোকের মুখেমুখে তিনি মিনলো পার্কের যাদুকর বলে পরিচিত হন। এডিসনের এত নামডাক প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সহ্য না হওয়া গল্প এবার না-হয়, দেখা যাক। ইংল্যান্ডের বৈজ্ঞানিক যোসেফ স্বায়ান ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের এক বিজ্ঞানমেলায় বৈদ্যুতিক ফিলামেন্ট যুক্ত বাল্ব পদার্থবিজ্ঞানে যুগান্তকারী আবিষ্কার, এটি তাঁর দাবি করেন। এদিকে এডিসনের জোরালো যুক্তি তিনিই এই উদ্ভাবনের মূল আবিষ্কারক এবং বৈদ্যুতিক ফিলামেন্ট বাল্ব তিনি প্রথম বাজারে এনেছেন, এক্ষেত্রে যথেষ্ট জলঘোলা হয়েছিল। অবশেষে বহু কৌণিক জালে বিস্তৃত হয়ে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়াল। পরবর্তীতে 'Edison-Swan Bulb' নতুন নামকরণ হওয়ায় বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়েছিল এবং পেটেন্টও যৌথ নামে আসে।

প্রযুক্তি বিজ্ঞানের আরও এক বা দুটি আবিষ্কারের বিবরণ অতি সংক্ষেপে দিয়ে আলোচনায় ইতি টানবো। টেলিগ্রাফ প্রযুক্তির কৌশল বিকাশ, উনিশ শতকে যোগাযোগ শিল্পে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। ১৮৬৩-১৮৭০ খ্রি. পর্যন্ত বারবার বসবাসের স্থান পরিবর্তন (নিউয়র্ক থেকে নিউ জার্সির বিভিন্ন জায়গা) করেও টেলিপ্রিন্টার মেশিনের গতি ও দক্ষতা উন্নত করেছিলেন। এরই মধ্যে মেরি স্টিল ওয়েল-কে ১৮৭১ খ্রি. বিয়ে করে ভবঘুরে জীবন ছেড়ে সংসার পাতেন। 'ফোনোগ্রাফ' ১৮৭৭-এ টিনের পাতে ছবি সেঁটে প্রথমে নির্মাণ করেন। দশ বছরের চেষ্টায় উন্নত ফোনোগ্রাফ যন্ত্র ঘূর্ণায়মান চোঙাকৃতি পাতের গায়ে ছবি এঁটে, একটি শক্তিশালী লেন্সের সাহায্যে ছবিগুলি দেখা সম্ভব হল যা ১৮৯০-এ, চলচ্চিত্র শিল্পের সাফল্য ঘটিয়েছে। আজকাল 'ইলেকট্রিক ভেহিকেলস' ব্যবহারের প্রসঙ্গ প্রায়শ আসে। এছাড়া স্টোরেজ ব্যাটারি প্রযুক্তি, উচ্চ কার্যক্ষম যুক্ত জেনারেটর, টেলিফোন স্পিকার, মাইক্রোফোনে ব্যবহৃত কার্বন বোতাম ট্রান্সমিটার, ভাস্বর বাতি, বৈদ্যুতিক রেলপথ, পাওয়ার সিস্টেম ও মোশন পিকচারের যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উদ্ভাবন কেবল উল্লেখ করলাম মাত্র। খ্যাতির মুকুটে একরকম অলঙ্কারবহুল মোহময় মর্যাদার কৃৎকৌশল চর্চার নিজস্ব নির্মাণের গরিমায় ভারবৃদ্ধির সমানতালে ব্যক্তিজীবনে আবেগপ্রধান বিপর্যয়, যেমন— তিনটি শিশুসন্তান রেখে প্রথম স্ত্রীর বিয়োগ (১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে) হলে মিনা মিনার-কে বিবাহ, মাঝেমধ্যে বাসা পরিবর্তন করে মানসিক শান্তির নিরিখে নির্মেদ কর্মপ্রবাহে জলোবাতাস সরিয়ে নিজে অবিচল থাকা, মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ইত্যাদি এমন সবকিছু।

একদিন, টমাস এডিসন মায়ের সেই ছোট্ট গ্রামে, তাদের ছোট্ট জন্মভিটেয় গিয়ে তাদের ঘর পরিস্কারের সময় আবর্জনাস্তুপের ভিতরে তাঁর ছেলেবেলায় স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের লেখা, মাকে দেয়া চিঠিটা পেয়ে টমাস কেঁদে ফেললো। তাতে লেখা ছিল— 'ম্যাডাম, আপনার ছেলে টমাস আলভা এডিসন, একজন মেন্টালি রিটার্ডেড; সে এতটাই নির্বোধ যে তাকে শিক্ষা দেওয়ার মত ক্ষমতা আমাদের নেই।

আপনার ছেলের কারণে আমাদের স্কুলের সুনাম নষ্ট হয়েছে, ওকে আরও রাখলে স্কুলের সুনাম অবশিষ্ট থাকবে না। তাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনার ছেলেটিকে স্থায়ীভাবে স্কুল থেকে বহিস্কার করা হল। 'এডিসনের প্রথম জীবনের এমন অজানা রহস্য ও প্রকৃত সত্য প্রকাশ হওয়ার পর অনেকটা সাময়িক ভেঙ্গে পড়েছিলেন আর তাঁর মায়ের সংযমী আচরণ ও তাঁর নিরলস অধ্যাবসার নেপথ্যে কারিগর যে তাঁর মা ছিলেন, তা স্পষ্ট হল।

আমার ধারণা, জগতের সব মা-ই-ই, তাঁর শিশু সন্তানকে মানুষ করে তুলতে গিয়ে এমন নীরব স্নেহধারা ও অপূর্ব সংযম দিয়ে এবং আকস্মিক দহন স্বীকার করে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলেন। যাইহোক, বিশ্ব বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিস্ময় প্রতিভার এই বিজ্ঞানী একেবারে সাধারণ অবস্থা থেকে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে নিজস্ব জীবনীশক্তিতে, আর অধ্যাবসায় অবিস্মরণীয় কীর্তিচিহ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৮৪ বছর বয়সে ওয়েস্ট ওরেঞ্জে তাঁর জীবনাবসান হয়।

লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: a.ghosh1@yahoo.co.in • *M. 8961228439*

ড. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

এগোনোর পথ খোঁজা খুবই জরুরি

জনবিজ্ঞান পত্রিকার প্রচার ও প্রসার বিজ্ঞান আন্দোলনের একটি ধারা। সমসাময়িক সময়ে 'বিজ্ঞান অন্বেষক' পত্রিকা সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান আন্দোলনের স্থবিরতা, ঘাটতি, ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রভাব এই পত্রিকার বিকাশ ও উৎকর্ষে পৌঁছানকে আচ্ছন্ন করছে। এগিয়ে চলার পথকে মসৃণ হতে দিচ্ছে না। এই প্রেক্ষিতে এগোনোর পথ খোঁজা খুবই জরুরি তথা প্রাসঙ্গিক।

প্রথমে বিজ্ঞান আন্দোলনের স্থবিরতা ও ব্যর্থতার কারণগুলো আলোচনা করা যাক—

(১) সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের প্রতিকূলতা

(ক) ভাববাদ/অবিজ্ঞানে আস্থা এবং বিজ্ঞান-বিরোধী মানসিকতার প্রচার ও প্রসার।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রপ্রধান, প্রশাসনিক প্রধান, রাজনীতিবিদদের মধ্যে ধর্মকে ব্যবহারের প্রবণতা ও ভাববাদ প্রচারে সরাসরি অংশগ্রহণ। বিভিন্ন মন্তব্য ও বক্তব্যে অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানকে উৎসাহ দেওয়া। বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, শিক্ষক, শিক্ষাব্রতী (সমাজের বিশিষ্ট বলে কথিত) মানুষের বিজ্ঞান-বিরোধী আচরণ ও বক্তব্য সমাজের জনমনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুদের বাড়বাড়ন্ত ও বিজ্ঞান-বিরোধী প্রচার। পারিবারিক স্তরে ধর্ম ও ভাববাদের প্রচার।

(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে চটকদারী ও নির্বোধ আমোদ প্রমোদের কাজে লাগানো। নিজের বিচক্ষণতা ও মননকে কাজে না লাগানো—

মোবাইল, ইন্টারনেট, জৈব প্রযুক্তির সম্ভার ব্যবহার করলেও মানুষ বিজ্ঞান-বিমুখ। বিজ্ঞানকে কাছে টানার, বিজ্ঞানের মজা, আনন্দ গ্রহণের প্রয়োজন তারা মনে করে না। স্থূল জৈব আমোদ-প্রমোদ, খেলা, মেলা, উৎসবেই ব্যস্ত। রাষ্ট্রশক্তি ও রাজনীতিবিদরা তাদের কার্যসিদ্ধি করে চলেছে। এদিকে মানুষ প্রশ্ন করতে ভুলে যাচ্ছে।

(গ) বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে কেরিয়ার গড়ার কাজে লাগোনোর প্রবণতা। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির শাখায় পড়ুয়ারা নিজের জীবনে বিজ্ঞানের ধর্ম (বিজ্ঞান মনস্কতা) প্রয়াগের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। নিজের আয় ও প্রতিষ্ঠা লাভের খেলায় মত্ত থাকে। তাই বিজ্ঞানের শিক্ষক, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসকদের হাতে ধারণের আংটি, মাদুলি, তাবিজ, সাদা, লাল সুতো শোভা পায়।

(২) বিজ্ঞানমনস্কতার পাঠ স্কুলের সিলেবাসে না থাকা

আরও বেশি করে 'catch them young' পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে গেলে স্কুলের সিলেবাসে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রাথমিক পাঠ ঢোকাতেই হবে।

(৩) বিজ্ঞান সম্প্রচারকদের ব্যর্থতা

কাজে সমন্বয়, সুচারু পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের অভাব চোখে পড়েছে। মনে হয় এই ব্যাপারে অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্বের অভাব রয়েছে।

বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রগতির জন্য যা যা করা দরকার—

১) বিজ্ঞান আন্দোলনের দুর্বলতা, ত্রুটি ও ব্যর্থতার কারণগুলি খুঁজে বের করে সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করা।

২) বিজ্ঞান সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা বাড়ানো এবং যৌথ কর্মসূচী নেওয়া।

৩) বিজ্ঞান আন্দোলনের সৈনিক অর্থাৎ বিজ্ঞানকর্মী বাড়ানো। পড়ুয়াদের এই কাজে উৎসাহিত ও আকর্ষিত করা। পড়ুয়াদের যুক্তিবাদী হতে উৎসাহিত করা।

৪) ভাববাদী প্রচার রুখতে তথা এর বিকল্প পথের সন্ধান দিতে বেশি করে বিজ্ঞান পদযাত্রা, বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং তাতে পড়ুয়াদের আকর্ষিত করা। সংবিধানের '৫১এ' ধারা 'এইচ' উপধারা মোতাবেক নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য হিসাবে বিজ্ঞানের মেজাজ তৈরি ও মানবতার সপক্ষে প্রচার আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

৫) সমস্তরকম বিজ্ঞান বিরোধী কার্যকলাপ (রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ ও সমাজের বিশিষ্টরা করলেও) এর বিরোধিতা করা। প্রচারপত্র বিলি করা ও সামাজিক গণমাধ্যমকে ব্যবহার করা।

বিজ্ঞান অন্বেষক-এর প্রগতির জন্য আশু প্রয়োজন—

১) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অন্বেষক প্রবন্ধ, বিতর্ক, কুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন করুক। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ ও পোস্টারগুলোকে পত্রিকায় স্থান দিতে হবে। এর জন্য একটি আলাদা বিভাগ রাখতে হবে।

২) 'পড়ুয়াদের দপ্তর' তৈরি করতে হবে। এতে পড়ুয়াদের নানান প্রশ্ন, সমস্যা ও মতামত গুরুত্ব সহ ছাপতে হবে।

৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পেশার মানুষের সমস্যা ও তার সমাধানের উদ্দেশ্যে 'প্রযুক্তি দপ্তর' চালু করা যেতে পারে।

৪) ব্যবসায়িক পত্রিকাগুলোর মত নিজস্ব বন্টন প্রণালী (distribution chain) তৈরি করা দরকার। পেশাদারী মনোভাব বাড়ানো জরুরি। বিজ্ঞান অন্বেষক-এর নিজস্ব বিজ্ঞাপন দেওয়া ও এই পত্রিকার প্রচার চালানোকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে।

৫) লেখক (বিশেষ করে পড়ুয়াদের) সম্মাননা ও সম্ভব হলে লেখা-পিছু সাম্মানিক দেওয়ার ব্যবস্থা করা। নতুন লেখকদের আকর্ষণ করা।

৬) বছরে ২-৩টি লেখক-পাঠক আড্ডার ব্যবস্থা করা। নিরন্তর গুণমানের বিচার, আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির পথ খোঁজা।

লেখক পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: joardar69@gmail.com • *M. 9231533335*

ড. তুষারকান্তি নাথ

নীলকুরিঞ্জির নীলিমায়

এরাভিকুলাম ন্যাশনাল পার্কের মূল ফটকে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন সকাল অনেকটা গড়িয়ে গেছে। রোদ ঝলমল করছে চারিদিকে। ন্যাশনাল পার্কের নিজস্ব ব্যাটারিচালিত দূষণহীন বাসে চড়ে চড়াই পথে চলে এলাম আরও গভীরে, আরও উঁচুতে। নিচে ঢেউ খেলানো মুন্নারের বিখ্যাত সবুজ চা-এর বাগান। চারপাশের সোলা ফরেস্টের তৃণভূমি ও সংলগ্ন অঞ্চল বেগুনি-নীল রঙা ফুলে ছেয়ে রয়েছে। যেন শিল্পির বোলানো তুলিতে ফুটে উঠেছে রঙিন ক্যানভ্যাস। এই ফুল দেখতেই এখানে আসা। এক যুগ অন্তর ফোটা এই ফুলের নাম নীলকুরিঞ্জি।

এরাভিকুলাম ন্যাশনাল পার্ক

নীল আকাশের নিচে আর এক নীলাম্বর

নীলকুরিঞ্জি ফুলের নামানুসারেই নীলগিরি পাহাড়ের নামকরণ হয়েছে বলে মনে করা হয়। এই গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Strobilanthes kunthiana* যা সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কুন্তী নদীর নামেই নামাঙ্কিত। Strobilanthes এর মোট ২৫০টি প্রজাতির মধ্যে ৪৬টি প্রজাতি ভারতে পাওয়া যায়। প্রতিটি প্রজাতির ফুল-ফোটার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। বিভিন্ন প্রজাতিতে এক থেকে ষোল বছর অন্তর ফুল ফোটে। নীলকুরিঞ্জি একটি এন্ডেমিক প্রজাতি যা একমাত্র দক্ষিণ ভারতের সোলা ও তৃণভূমি বাস্তুতন্ত্রে জন্মায়। কেরালা, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তে এদের দেখা যায় না। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার আন্নামালাই হিল, কার্ডামন হিল, নীলগিরি হিল, পালানী হিল, বাবাবুদাংগিরি এবং সান্দুরু হিলে এই উদ্ভিদ জন্মায়। পূর্বঘাট পর্বতমালার শেভরয় পর্বতেও এই গাছের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। ফুল ফোটার সময় সারা পাহাড় ছেয়ে যায় নীল রঙে। এ যেন নীল আকাশের নিচে আরেক নীল চাঁদোয়া।

নীলকুরিঞ্জি ফুল

অঙ্গসংস্থান ও বিশেষত্ব

নীলকুরিঞ্জি এক প্রকার গুল্মজাতীয়, বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ১৩০০-২৪০০ মিটার উচ্চতার আর্দ্র পর্ণমোচী অরণ্যের ঘাসযুক্ত ঢালু ভূমি এবং সোলা তৃণভূমি হল এদের আবাসস্থল। শাখা-প্রশাখাময় কিঞ্চিৎ ঝোপঝাড়যুক্ত এই উদ্ভিদের উচ্চতা ৩০-৬০ সেমি হলেও কখনও কখনও এরা ১৮০ সেমি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। পাতা লম্বাটে-ডিম্বাকৃতি, কিনারা খাঁজযুক্ত। পাতার দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় সেমি। ফুল উভলিঙ্গ, ঘণ্টাকৃতি, উজ্জ্বল বেগুনি-নীল বর্ণের, প্রায় তিন সেমি লম্বা। দলমণ্ডল নলাকৃতি, অগ্রভাগে পাঁচটি লোব থাকে। ফুল প্রস্ফুটিত হওয়ার তৃতীয় দিনে ঝরে পরে। পুষ্পবিন্যাস রেসিম প্রকৃতির। প্রতিটি উদ্ভিদ গড়ে ৮০টি পুষ্পবিন্যাস ধারন করে এবং প্রতিটি বিন্যাসে গড়ে ২০টি ফুল ফোটে। অর্থাৎ একটি নীলকুরিঞ্জি উদ্ভিদে প্রায় ১৬০০টি ফুল ফোটে। কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটা পর্যন্ত প্রতিনিয়ত ফুলের রঙ বদলাতে থাকে। ফুলে নেক্টর গ্ল্যান্ড থাকায় প্রচুর মধু পাওয়া যায়।

বারো বছর পরেই কেন?

নীলকুরিঞ্জি উদ্ভিদে বারো বছর অন্তর ফুল ফোটে। বেগুনি-নীল রঙের ফুলে ছেয়ে যায় সারা গাছ। ফুল ফোটার সময়কাল আগস্ট থেকে অক্টোবর মাস। এই সময় মুন্নার ও সংলগ্ন পাহাড়ি ঢাল মায়াবী নীলাভ রঙে স্নাত হয়। নীলকুরিঞ্জি একপ্রকার Monocarpic উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদের জীবদ্দশায় একবারই ফুল ফোটে। ঠিক যেমন বাঁশ গাছ চল্লিশ বছর বা তার বেশি সময় নেয় ফুল ফোটার জন্য এবং তার পর মারা যায়। নীলকুরিঞ্জি উদ্ভিদে বারো বছর পর দলবদ্ধভাবে অসংখ্য ফুল ফোটে, প্রচুর বীজ একসাথে উৎপন্ন হয় এবং ফুল-ফল একবারই উৎপন্ন হওয়ার পর উদ্ভিদটি মারা যায়। তাই নীলকুরিঞ্জি একপ্রকার Plietesials প্রকৃতির উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদে শেষ বার ফুল ফুটেছিল ২০১৮ সালে। পরবর্তী ফুল ফোটার সময় ২০৩০ সাল।

উপযোগিতা

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে স্নায়ুবিক বিকার, গ্ল্যান্ডুলার সোয়েলিং, ইডিমা ইত্যাদি রোগ নিরাময়ে নীলকুরিঞ্জি উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়। এই উদ্ভিদের অগ্নি নির্বাপক বৈশিষ্ট্য থাকায় দাবানলের সময় তৃণভূমির প্রাকৃতিক রক্ষক হিসাবে কাজ করে। এছাড়াও নীলকুরিঞ্জি উদ্ভিদ ভূমিক্ষয় রোধ করে। এই গাছের ফুল থেকে সংগৃহীত মধু সুস্বাদু, পুষ্টিগুণযুক্ত এবং ঔষধিগুন সমন্বিত। বারো বছর অন্তর নীলকুরিঞ্জির ফুল-ফোটার বিষয়টিকে তামিলনাড়ুর পালিয়ান উপজাতির মানুষজন তাদের বয়স নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করেন।

নীলকুরিঞ্জি ফুলে ছেয়ে আছে নীলগিরি হিল

সংরক্ষণ—কেন ও কীভাবে

সোলা অরণ্যের পাহাড়ি ঢালে চা ও কফি চাষ বৃদ্ধির ফলে নীলকুরিঞ্জির বাসস্থানগত সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও মুন্নার ও সংলগ্ন অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান পর্যটন শিল্প, জমির জবর দখল, জলাভাব এবং প্লাস্টিক দূষণের ফলে এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতিসাধন হয়েছে। তার প্রভাবে নীলকুরিঞ্জির উদ্ভিদের আবাসস্থলের প্রকৃতিগত পরিবর্তন হচ্ছে। নীলকুরিঞ্জি উদ্ভিদের বর্তমান বিপদসমূহ দূর করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কেরালার ইদুক্কি জেলার কোট্টাকাম্বোর ও ভাট্টাভাদা এলাকার ৩২ বর্গ কিমি জায়গা জুড়ে ২০০৬ সালে কুরাঞ্জিমালা স্যাংচুয়ারী স্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও এরাভিকুলাম ন্যাশনাল পার্কসহ যে কোন সংরক্ষিত এলাকায় নীলকুরিঞ্জি ফুল ও গাছ তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি অন্য কোথাও এই উদ্ভিদ রোপণের জন্য গাছের চারা ও ফল বা বীজ সংগ্রহও পুরোপুরি বেআইনি। তবে সাধারণ মানুষের সামগ্রিক চেতনাই পারে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার এই এন্ডেমিক প্রজাতিকে রক্ষা করতে।

ক্লারে ফ্লাইন এবং

নীলকুরিঞ্জি ফুল স্থানীয় সমাজ জীবনে কতটা প্রভাব ফেলেছে তা বোঝা যায় তামিলনাড়ুর কোদাইকানালে ভগবান কার্তিকের মন্দিরের নামকরণের মধ্য দিয়ে। এই মন্দির 'কুরিঞ্জি আন্দাভার' মন্দির নামে পরিচিত। তামিল সাহিত্যেও নীলকুরিঞ্জির উল্লেখ পাওয়া যায়। তামিল সঙ্গম সাহিত্যে পাঁচ প্রকার জমি বিভাজনের কথা বলা আছে। তার মধ্যে একটি হল কুরিঞ্জি বা পাহাড়ি। সারা পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় ২০০৬ সালে প্রচুর নীলকুরিঞ্জি ফুল ফুটেছিল। সমগ্র বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ পর্যটক এসেছিল তার সাক্ষী থাকার জন্য। কেরল সরকার ২০০৬ সালকে 'Year of Kurinji' ঘোষণা করে। ঐ বছরই ভারতীয় ডাক বিভাগ অভাবনীয় ভাবে কুরিঞ্জি ফুলের ওপর এক ডাক টিকিট প্রকাশ করে। বিশিষ্ট ব্রিটিশ সাহিত্যিক ক্লারে ফ্লাইন ২০১৪ সালে Kurinji Flower নামে এক উপন্যাস লেখেন যার পটভূমি ছিল ১৯৪০ সালের ব্রিটিশ কলোনিয়াল মুন্নার এবং অবশ্যই নীলকুরিঞ্জি। উপন্যাসটি BRAG Medallian পুরস্কার পায়। এক প্রকার ফুলের প্রজাতিকে নিয়ে সারা বিশ্বের এই উন্মদনা সত্যিই বিস্ময়কর।

সূর্য তখন মধ্য গগনে, বিকিরিত কিরণে উদ্ভাষিত উপত্যকা ও পাহাড়ি চরাচর। আমরা নেমে আসছি এরাভিকুলাম জাতীয় উদ্যান থেকে। পিছনে ফেলে আসছি নয়নাভিরাম নীলকুরিঞ্জি ফুলের নীল চাঁদোয়া। সেই ফুলের উপত্যকা থেকে ক্লারে ফ্লাইন-এর 'Kurinji Flower' এর প্রধান চরিত্র, জিনি ডুনবার হাত তুলে যেন বলছে—'আবার এসো কিন্তু'। আবার আসতেই হবে নীলগিরির নীল নীলিমায়।

লেখক বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: tushar_kly@rediffmail.com • *M. 9635547188*

ডা. ভবানীপ্রসাদ সাহু

অঙ্গারক যোগ

গত বছর (২০২২) ২৭ জুন থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত আগুনের গ্রহ মঙ্গল আর বায়ুর গ্রহ রাহু খুব কাছাকাছি ছিল। জুলাই মাসে খবরের কাগজে বেরোন একটি সংবাদ থেকে জানা গেল, জ্যোতিষীরা বলেছে এই সময়টা খুব বিপজ্জনক। আগুন আর বাতাস যেহেতু কাছাকাছি এসেছে তাই ভয়ংকর বিপদের সম্ভাবনা আছে। একে বলে অঙ্গারক যোগ। ৩৭ বছর আগে এমনই পরিস্থিতিতে নাকি এয়ার ইন্ডিয়ার দুর্ঘটনায় ৩২৯ জন মারা গেছিলেন। অর্থাৎ ঐ ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পেছনে খারাপ আবহাওয়া, বিমানের ত্রুটি, চালকের ভুল ইত্যাদি ধরনের কারণ নয়, দায়ী ছিল মঙ্গল আর রাহুর কাছাকাছি আসা। মুশকিল হচ্ছে ঐ সময় সরকারিভাবে কোন উপায়ে মহাকাশের মঙ্গল আর 'রাহু'-কে দূরে সরানোর কোন ব্যবস্থা করা হয়নি, যাতে সম্ভাব্য আরো বিপদ আটকানো যায়। উল্টে ঐ দুর্ঘটনার পেছনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল।

২০২২-এর ঐ 'মহাসর্বনাশা অঙ্গারক যোগ'-এর জন্য জ্যোতিষীরা বলেছিল, প্রতিদিন সকালে বীজমন্ত্র জপ, হনুমান চালিশা পাঠ, দেবদেবী বা মায়ের পায়ে ফুল দেওয়ার মত কাজকর্ম করলে তার 'দোষ' তথা ভয়াবহতা আটকানো যাবে। এইসব হাস্যকর ক্রিয়াকান্ড তাদের মত দু-চারজন জ্যোতিষী বা অন্ধভক্তরা কেউ কেউ করে থাকলেও করে থাকতে পারেন। কিন্তু দেশ জুড়ে যে তা করা হয়নি, তা আমরা জানি। এবং তাতে আলাদা কোন বিপদ হয়নি (হলেও তার পেছনে ঐ 'অঙ্গারক যোগ' অবশ্যই দায়ী থাকত না)। বরং দেখা গেছে ঐ সময়কালে তখন দেশ জুড়ে চলা যে কোভিড-এর বিপদ তার প্রকোপ ধীরে ধীরে কমেছে। যেমন ভারতে ২৭ জুন, ২০২২ তারিখে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন ১৭,০৭৩ জন ও মারা গেছিলেন ২১ জন। ২৬ জুলাই আক্রান্ত হয়েছিলেন ১৪,৮৩০ জন ও মৃত ৩৬ জন। ৮ আগস্ট তারিখে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১২,৭৫১ ও ৪২। অর্থাৎ আক্রান্তের সংখ্যা যথেষ্ট কমেছে কিন্তু মৃত্যু ২-৪টে বেড়েছে। 'অঙ্গারক যোগ'-এর প্রচারকরা বলতে পারে সংক্রমণ কমা সত্ত্বেও মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি এই মঙ্গল-রাহুর জন্য। কিন্তু ঐ 'যোগ' কেটে যাওয়ার পরেও দেখা গেল মৃত্যুর সংখ্যা আহামরি কিছু কমেনি, যেমন ৩১ আগস্ট কোভিডে মারা গেছিলেন ৪৫ জন ভারতীয়, ১৬ সেপ্টেম্বর ৩৪ ইত্যাদি। তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই সংক্রমণ ও মৃত্যু ওঠা-নামা করতে করতে ক্রমশ কমতেই থেকেছে।

প্রকৃতপক্ষে কোভিডের বিপদই হোক অথবা কোন পার্থিব প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাই হোক, কোনটির জন্যই ৪ ধরনের 'অঙ্গারক যোগ'-এর মত হাবিজাবি কোন কিছু ভূমিকা রাখে না। রাখা সম্ভবও নয়। মঙ্গলের মত গ্রহাদি পৃথিবী থেকে এতদূরে যে, তার আকর্ষণ-বিকর্ষণ বা অন্য কোন প্রভাবে মহামারি, রেল বা বিমান দুর্ঘটনা ইত্যাদির মত কোন কিছু ঘটানো কোনভাবেই সম্ভব নয়। আর 'রাহু'তো মহাকাশে একটি কল্পিত এলাকা মাত্র।

শুধু অঙ্গারক যোগ নয়, জ্যোতিষ মতে তথা পঞ্জিকায় যথা, অশ্লেষা, বারবেলা থেকে শুরু করে এ্যহস্পর্শ-এর মত নানা কিছুর কথা বলা হয়, যার সঙ্গে তথাকথিত শুভ-অশুভের ব্যাপারগুলো জড়ানো হয়েছে। নিছকই প্রাচীন কিছু কল্পনা দীর্ঘদিন প্রচারিত হতে হতে বহু মানুষের মধ্যে কিভাবে বদ্ধমূল একটি বিশ্বাসে পরিণত হতে পারে তার অন্যতম প্রকৃষ্ট একটি উদাহরণ এই তথাকথিত 'যোগ' অর্থাৎ বিশেষ দিনক্ষণ সময়ের ব্যাপারটি। কোন গ্রহ-নক্ষত্র যে বিশেষ কোন দিন বা সময়কে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট করতে পারে না, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবু এখনো বিশেষ করে ভারতের মত দেশের বেশ কিছু মানুষ জ্যোতিষ্কের মত সম্পূর্ণ মিথ্যা একটি শাস্ত্রে তথা অপবিজ্ঞানে গভীর আস্থা পোষণ করেন এবং দৈনন্দিন জীবনে এগুলিকে জড়িয়ে রেখেছেন।

এইভাবে জ্যোতিষীদের বলা 'অঙ্গারক যোগ' যেমন মিথ্যা এবং তার কোন বিশেষ গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তেমনি আমাদের বিশ্বাস থেকেও ঐ শুভ-অশুভ দিনক্ষণের মিথ্যাগুলিকে দূর করা দরকার।

লেখক চিকিৎসক এবং বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক

email: sahoo2331953@gmail.com • M. 8777598939

কৌশিক রায়

নতুন গ্যালাক্সির সন্ধানে

আমাদের পরিচিত গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রমণ্ডলী বলতে আমরা ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গাকে (Milky Way) বুঝে থাকি। তবে আকাশগঙ্গা ছায়াপথের চারদিকে ছড়িয়ে আছে আরো কয়েকটি ছোট ছায়াপথ বা মহাকাশীয় মেঘমণ্ডলী। এই ধরনের উপগ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলী বা স্যাটেলাইট গ্যালাক্সি সম্পর্কে নতুন করে গবেষণার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

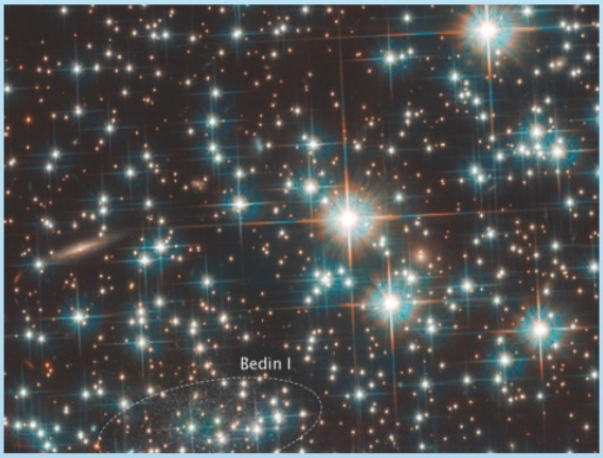

আকাশগঙ্গা ছায়াপথের দক্ষিণ দিকে আছে ম্যাগেলানিক ক্লাউড (প্রথম জলপথে ভূ-পর্যটনকারীর নামে নাম) নামক একটি নক্ষত্রমণ্ডলী। দেখে মনে হয় আকাশগঙ্গা ছায়াপথের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ এই ম্যাগেলানিক ক্লাউড। বেশ কয়েকটি ধূমকেতুকে এই ম্যাগেলানীয় মেঘপুঞ্জের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেছে। ক্রমশঃই আকাশগঙ্গা ছায়াপথের আরো কাছে চলে আসছে এই ম্যাগেলানীয় মেঘপুঞ্জ। এই মেঘপুঞ্জের মধ্যে তৈরি হচ্ছে এবং তৈরি হবে অসংখ্য নক্ষত্র এবং গ্রহ। এই ম্যাগেলানীয় মেঘপুঞ্জ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে এই ম্যাগেলানীয় মেঘপুঞ্জের প্রতিটির মধ্যে প্রায় ১৯ বিলিয়ন-এর মতো জ্যোতিষ্ক আছে। তবে, অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলছেন বড় মাপের ম্যাগেলানীয় মেঘপুঞ্জের মধ্যে ৩০ বিলিয়ন নক্ষত্র আছে। বড় ম্যাগেলানীয় মেঘপুঞ্জের মতনই আরেকটি ঘূর্ণির মতো (স্পাইরাল) নক্ষত্রমণ্ডলী— 'ট্রাইঅ্যাঙ্গুলাম গ্যালাক্সি' বা 'এম-৩৩'-কে খুঁজে পেয়েছেন মহাকাশবিজ্ঞানীরা।

হাবল্ মহাকাশ দূরবীন-এর মাধ্যমে ম্যাগেলানিক ক্লাউড-এর গতিবেগ নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়েছে। এই মেঘপুঞ্জের পিছনে প্রায় ২০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত রয়েছে বেশ কয়েকটি কোয়াসার জাতীয় তারা। ম্যাগেলানীয় মেঘপুঞ্জ সর্বদাই ঘূর্ণায়মান, পরিবর্তনশীল। দুটি ম্যাগেলানিক ক্লাউড-এর মধ্যেই নিত্যনতুন তারা তৈরি করার জন্য পর্যাপ্ত হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, জেনন, আরগন-এর মতো বিভিন্ন গ্যাস মজুত আছে। ম্যাগেলানীয় মেঘপুঞ্জের মধ্যেই আছে 'ট্যারান্টুলা' নামক একটি উজ্জ্বল নীহারিকা বা নেব্যুলা।

এইরকম আরো নেব্যুলা তৈরি হয় ম্যাগেলানিক ক্লাউড-এর মধ্যে। এগুলির মধ্যে আছে 'সুপারনোভা' গোত্রের অনেকগুলি তারা। প্রতিমুহূর্তে শত শত তারার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে। ধ্বংস হচ্ছে, আবারও সৃষ্টি হচ্ছে বেশ কিছু নক্ষত্র। এক ব্রহ্মাণ্ডীয় ভাঙাগড়ার খেলা নিত্যনতুন ভাবে চলছে ম্যাগেলানীয় মেঘপুঞ্জের মধ্যে। হাবল্ মহাকাশ দূরবীন থেকে তোলা ছবির মাধ্যমে জানতে পারা গেছে কিভাবে আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে বিভিন্ন নক্ষত্রের জন্ম হয়েছিল। সুপারনোভাটি থেকে ঘন্টায় ১১ মিলিয়ন মাইল গতিবেগে মহাজাগতিক ধূলিকণা ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। আদিকালের সেই প্রলয় বিস্ফোরণের সাক্ষী এই ম্যাগেলানিক ক্লাউড।

মিল্কিওয়ে এবং ম্যাগেলানিক ক্লাউড-এর চারদিকে বেশ কয়েকটি নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেমন, স্কাল্পটন, ফোম্যাক্স, সেক্সট্যান্স, স্যাজিটারিয়াস, হারকিউলিস, সেস্তয়ে, দ্রাকো, ক্যারিনা ইত্যাদি। মহাকাশবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন ম্যাগেলানীয় মেঘপুঞ্জের মধ্যে যে পরিমাণ গ্যাস আছে তা দিয়ে আগামী ১০ লক্ষ বছরের জন্য পারমাণবিক শক্তির যোগান দেওয়া যায়। অদূর ভবিষ্যতে ছায়াপথের এই ছায়াসঙ্গী ম্যাগেলানিক ক্লাউড থেকে আমরা মহাকাশ সম্বন্ধে ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য নিঃসন্দেহে জানতে পারব।

লেখক শিক্ষক ও বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক ● M. 9547659679

BIGYAN ANNESWAK VOL : 20 Issue No. 2 March - April 2023 RNI : WBBEN/2003/11192 Rs. 20-
ISSN 2582-5674

জয়শ্রী দত্ত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

(তালিয়ের)

"ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রাম, শুনে লাগে খটকা—
ফুল ফোটে...? তাই বল।
আমি ভাবি পটকা।"

সুকুমার রায়ের কবিতাটায় অতিরঞ্জন থাকলেও এটা ঘটনা যে কোন কোন ফুল ফোটার সময় সত্যি সত্যিই শব্দ হয়। নিস্তব্ধ রাত্রে ফুল ফোটার শব্দ গ্রামবাসীদের কানে আসে,—আর সে ফুলও হয় আশ্চর্যরকম। গাছটার নাম তালিয়ের।

এর বিজ্ঞানসম্মত নাম 'কোরাইফা তালিয়েরা' (Corypha taliera) গ্রীক শব্দ 'Koruphe' থেকে ল্যাটিন ভাষায় গণের নাম 'corypha' হয়েছে। 'Koruphe' শব্দের অর্থ হল 'মাথা' বা 'শিখর'। গাছের মাথায় হওয়া বিচিত্র দর্শন পুষ্পবিন্যাসের জন্যই গণের নাম 'কোরাইফা' হয়েছে। বাংলা নাম 'তালিয়ের' থেকেই প্রজাতির নাম 'তালিয়েরা' হয়েছে।

তালিয়ের গাছটা দেখতে অনেকটা তালগাছের মত, তবে অনেক বড়। তালিয়ের গাছের কাণ্ড, পাতা বা পাতার বোঁটা সবই তালের থেকে বড়। তালের পুষ্পবিন্যাস বের হয় পাতাগুলোর মাঝখান থেকে। একটা তালগাছ বহু বছর ধরে ফুল, ফল দিতে পারে, কিন্তু তালিয়ের গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি শেষ হওয়ার পর ফুল ফোটে, তখন গাছের পাতাগুলো নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে, আর নৌকোর মতো মঞ্জরীপত্র দিয়ে ঢাকা পুষ্পবিন্যাস বেরিয়ে আসে সোজা উপর দিকে। পুষ্পবিন্যাসটা বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। শাখামঞ্জরীগুলো আবার আলাদা আলাদা মঞ্জরীপত্র দিয়ে ঢাকা থাকে। ক্রমশ পরিণত হয়ে আসা পুষ্পবিন্যাসের চাপে এক সময় সবগুলো মঞ্জরীপত্র একসঙ্গে খুলে গিয়ে ভেতর থেকে সম্পূর্ণ পুষ্পবিন্যাস বেরিয়ে আসে। পুষ্পবিন্যাসের প্রধান মঞ্জরীদণ্ডের ও শাখা-মঞ্জরীদণ্ডের রঙ হলুদ রঙের। ফুলের রঙও হলুদ। মঞ্জরীদণ্ডের ওপরে ৩-৬টা ফুল একসঙ্গে গুচ্ছাকারে থাকে। লম্বা শাখামঞ্জরী দণ্ডের ওপরে ফুলগুলোকে ঘন সন্নিবদ্ধ অবস্থায় দেওয়া যায়। গরমকালে ফুল হয়, তারপর ফল পাকতে সময় নেয় ১৫-২০ মাস। ফল পেকে ঝরে যাওয়ার পর গাছটাও মরে যায়। সম্পূর্ণ জীবদ্দশায় একবারই গাছে ফুল, ফল হয়।

অপরিণত অবস্থান সাধারণ মানুষ তালের সঙ্গে তালিয়েরের তফাৎ ধরতে পারে না। ফুল হওয়ার সময়ই তফাৎ চোখে পড়ে। ১০ মিটার লম্বা গাছের ওপর ৬ মিটার লম্বা মঞ্জরীদণ্ড, সাধারণ কোন পুষ্পবিন্যাসের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। আশি থেকে একশ বছরে একটা গাছে ফুল আসে, ফলে এমন গাছে ফুল ফুটতে দেখেছে সেরকম লোকের সংখ্যা খুবই কম। আবার ফুল, ফল হচ্ছে না তালগাছে এই ভেবে যদি কেউ তালিয়ের গাছ কেটে ফেলে তবে তো নতুন গাছ হওয়ার সম্ভাবনা সেখানেই শেষ। পাম বিশেষজ্ঞ ড শ্যামল বসুর কাছে শুনেছিলাম ১৯৮৬ সালে বীরভূমের শান্তিনিকেতনের কাছে এক গ্রামে একটা তালিয়ের গাছকে ভুতুড়ে তালগাছ মনে করে গ্রামবাসীরা কেটে ফেলে। গাছটা তখন ফল ধরার প্রাথমিক অবস্থায় ছিল।

স্বাভাবিক নিয়মেই গাছের পাতা ফল ধরার সময় শুকিয়ে যেতে থাকে, ঐ গ্রামের মানুষ তালিয়ের গাছ সম্বন্ধে কিছুই জানত না, ফলে তারা ভয় পেয়ে